শ্রীপঞ্চমী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

দু' টাকা

শ্রীপঞ্চমী—১৩৫৪

চিত্রশিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয় ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন হইতে শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাণী-মাকে দিলাম

লাভপুর }
বীরভূম }

সূচীপত্র



সত্যপ্রিয়ের কাহিনী

এক ছিলেন রাজা। মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন তিনি। বহু রাজা তাঁকে কর দিত। সসাগরা ধরার অধীশ্বর বললেও চলে। রাজকোষ মণি-মুক্তা হীরা-জহরৎ সোনা-রূপায় পরিপূর্ণ, সৈন্যশালায় রাজভক্ত সুশিক্ষিত বিক্রমশালী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সেনাপতি,—হাতিশালায় ঐরাবতের মত হাতি, অশ্বশালায় উচ্চৈঃশ্রবার মত ঘোড়া, অসংখ্য দাসদাসী নিয়ে রাজার সৌভাগ্য বর্ষার নদীর মত কানায় কানায় পরিপূর্ণ। রাজা নিজেও খুব বিক্রমশালী পুরুষ। প্রজা থেকে, কর্ম্মচারী থেকে মন্ত্রী পর্য্যন্ত কেউই রাজার মুখের দিকে চাইতে সাহস করেন না। সূর্য্যের দিকে যেমন চাওয়া যায় না, অমিততেজী সেই যে রাজাধিরাজ, তাঁর মুখের দিকেও তেমনই চাওয়া যায় না।

কিন্তু রাজার একমাত্র দোষ—রাজা ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে মহা অহঙ্কারী। তিনি যখন চ'লে যান, তখন পায়ের শব্দে তাঁর দম্ভ লোকে অনুভব করে, রাজপ্রাসাদ যেন কাঁপে।

রাজার পুত্র-সন্তান নাই, আছে দুটি কন্যা। বড়টির নাম মুক্তামালা, ছোটটির নাম কাজলরেখা। রাজার রাণী নাই। মেয়ে দুটির শৈশবেই তিনি মারা গিয়েছেন। রাজা আর বিবাহ করেন নাই। মেয়ে দুটিকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। তারা যা চায়, তাই দেন। মেয়েদের ধাইমা মেয়েদের মানুষ করে। তারা আপন মনে নিজের নিজের খুশিমত খেলা করে, গান গায়, হাসে, খায়-দায়। রাজপণ্ডিত আসেন, তাঁর কাছে পাঠ নেয়, দিনে দিনে কুঁড়ি থেকে যেমন একটু একটু ক'রে পাপড়ি মেলে ফুল ফোটে, তেমনই ক'রে তারা বড় হয়ে ওঠে।

এক বাপ-মায়ের দুই মেয়ে,—কিন্তু আশ্চর্য্য রূপে গুণে দুই মেয়ে ঠিক বিপরীত। বড় মেয়ের রূপ দেখলে চোখ যেন ঝলসে যায়, 'আয়নাতে রোদের ছটা প'ড়ে তার আভা যেমন ঝকমক করে, তেমনই রূপ তাঁর। গুণেও ঠিক তাই। শানিত অস্ত্রের মত তাঁর স্বভাব। দাসদাসী সকলে তাঁর কাছে জোড়হাত ক'রে সশঙ্কিত হয়ে থাকে। আর ছোট রাজকুমারী কাজলরেখার রূপ শান্ত স্নিগ্ধ, দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়, পূর্ণিমারাত্রির জ্যোৎস্নার মত; স্বভাবও ঠিক তেমনই মধুভরা ফল যেমন মধুর ভারে নুয়ে পড়ে, মিষ্ট গন্ধে বুক ভরিয়ে দেয়, তেমনই ধারা মধুর প্রকৃতি তাঁর, ঠোঁটের ডগায় হাসি

লেগেই আছে, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের মত সে হাসিটুকু।

বড় রাজকন্যা মুক্তামালা মেয়ে হ'লেও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, তিনি ঘোড়ায় চড়েন, শিকার করতে যান, তাঁর তীর ছোটে উল্কার মত। আকাশের বুক থেকে মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায় যেসব পাখী, তাঁর তীর তাদের বিঁধে মাটির বুকে নামিয়ে আনে ঝড়ে ঝ'রে-পড়া ফুলের মত। কাজলরেখাও রাজকন্যা সেই হিসেবে তিনিও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, কিন্তু অস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ বেশি। তিনি ঘরে ব'সে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন। পড়তে পড়তেই দিন শেষ হয়ে যায়, ঘরের আলো ক'মে যায়, তিনি গিয়ে বসেন তখন জানালার ধারে। আকাশের বুকে পাখীর ঝাঁক উড়ে যায় গান ক'রে—তাদের গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। আঁচলে ক'রে নিয়ে যান পঞ্চশস্য, ছাদের উপর অঞ্জলি ভরে ছড়িয়ে দেন, ডাকেন তাদের—আয়—আয়—আয়। ওরে পাখীরা তোদের আমি ভালবাসি, তোরা খেয়ে যা। তারা শন্‌শন শব্দে পাক দিয়ে নেমে আসে, কেউ বসে তাঁর মাথায়, কেউ ব'সে কাঁধে, কেউ বসে হাতে,—বসবার জায়গা যারা না পায়, তারা পাক দিয়ে দিয়ে উড়তে থাকে; যেমন ভ্রমর ওড়ে ফুলের চারিদিকে, মাছেরা ঘোরে জলবালার চারিদিকে, তারার দল ঘোরে চাঁদের চারিদিকে, তেমনই ভাবে তারাও কাজলরেখাকে প্রদক্ষিণ ক'রে উড়তে থাকে।

এইভাবে দিন যায়।

ক্রমে মেয়েরা বড় হয়ে উঠলেন। একদিন রাজবাড়ির বৃদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে বললেন, কন্যাদের এইবার বিবাহের কাল হয়েছে। মহারাণী নাই, থাকলে তিনিই রাজাধিরাজকে একথা বলতেন। তাঁর অভাবে, কর্ত্তব্য আমার, আমিই আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

রাজা সচেতন হয়ে উঠলেন। মনে মনে হিসাব ক'রে দেখলেন, হ্যাঁ তাই তো, মুক্তামালার বয়স হ'ল আঠারো, আর কাজলরেখার ষোল।

তিনি ডাকলেন মেয়েদের। দেখলেন। চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন সদ্যফোটা দুটি পদ্মফুল।

বড় মেয়ে প্রণাম ক'রে বাপের বিছানায় পাশে বসলেন, কাজলরেখা বাপকে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের কাছে বসলেন।

রাজা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কাজলরেখাকে বললেন, একি, তুমি মাটিতে বসলে কেন? উঠে ব'স।

কাজল বললেন, বাবা, শাস্ত্রে আছে, পিতা দেবতা, তাঁর সঙ্গে সমাসনে বসা উচিত নয়, তাঁর পায়ের তলাতেই বসা কর্ত্তব্য। আর আসন হিসাবে মৃত্তিকাই হ'ল শ্রেষ্ঠ আসন। তবে আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন তাই বসছি।

এ উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হলেন।

তারপর কন্যাদের পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, মা, তোমরা এইবার বড় হয়েছ। বিবাহের বয়স হয়েছে।

বিবাহ দিতে হবে। কিন্তু পাত্র সন্ধান করবার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই, তোমাদের কার কিরূপ আকাঙ্ক্ষা, কে কেমন স্বামী প্রার্থনা কর?—মা মুক্তামালা, তুমি বড়, তুমিই বল আগে।

মুক্তামালা বললেন, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার স্বামী হবেন তিনি, যিনি শৌর্য্যে বীর্য্যে তেজস্বিতায় হবেন আপনার যোগ্য জামাতা। রূপে হবেন তিনি কন্দর্পের মত. বীর্য্যে হবেন তিনি ঝড়ের সদৃশ,—পবনদেবতার মত।

রাজা হেসে কন্যার কথায় বাধা দিয়ে রহস্য করলেন, বললেন, তা হ'লে তোমার ছেলের প্রকাণ্ড লেজ থাকবে মা। কেন না, পবননন্দন হলেন হনুমান। পিঠের উপর লেজ তুলে দিয়ে 'জয় রাম' ব'লে এক লাফে সাগর ডিঙিয়েছিলেন। জান তো?

মুক্তামালা একটু লজ্জিত হলেন।

রাজা হেসে বললেন, বল—বল।

মুক্তামালা বললেন, তিনি বীর্য্যে পবনের মত হবেন এইজন্য যে, শত্রুকুল তাঁর বীরত্বের সম্মুখে বড় বড় গাছের মত ভেঙ্গে পড়বে। তেজে তিনি হবেন অগ্নির মত, তাঁর রক্তচক্ষুর দৃষ্টির উত্তাপে, যারা দুষ্ট, যারা হবে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তারা অগ্নির সম্মুখে তৃণের মত ম্লান হয়ে শুকিয়ে যাবে; তাতেও যারা সংযত না হবে, তারা সেই তেজে হবে ভস্মীভূত। তাঁকে হতে হবে খ্যাতিমান প্রাচীন রাজবংশের সন্তান। যেহেতু সকল গুণের আকরই হ'ল

বীজ,—অমৃতফলের বীজ হতে জন্মায় যে গাছ, সে গাছের ফল কখনও বিস্বাদ অথবা বিষাক্ত হয় না। সংসারে জন্মগুণই শ্রেষ্ঠ।

রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন কন্যার কথা শুনে।—হ্যাঁ, তাঁর মত রাজাধিরাজের উপযুক্ত কন্যা। রাজকন্যার উপযুক্ত কথা বলেছে সে।

কন্যার মাথায় হাত দিয়ে বাপ আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন, তুমি ইন্দ্রাণীর মত ভাগ্য লাভ কর। তোমাকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি। তোমার মনোমত স্বামীই আমি অনুসন্ধান করব। পৃথিবীতে না পাই, দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক'রে অবশ্যই নিয়ে আসব।

মুক্তামালার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তারপর রাজা ছোট মেয়ের দিকে ফিরে হাসিমুখে, অত্যন্ত আদরের সঙ্গে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, মা, এইবার তুমি বল তোমার মনের কথা।

কাজলরেখা চুপ ক'রে রইলেন। বাপকে নিজের বিয়ের কথা—বরের কথা বলতে লজ্জা হ'ল তাঁর।

রাজা হেসে আবার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, লজ্জা বোধ করছ? আচ্ছা, থাক্। আমি বুঝেছি, তোমার দিদি যা বলেছেন, তাঁর যেমন আকাঙ্ক্ষা, তোমারও কল্পনা তেমনই, বক্তব্যও তোমার তাই।

কঞ্চুকী বিনয় ক'রে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, অন্যপ্রকার বাসনা বা বক্তব্য থাকবে কেন? পর্ব্বতের কন্যা হ'ল নদী। নানা ধারায়, নানা দেশের মধ্যে দিয়ে তারা স্বয়ম্বর

হবার জন্য ছুটে চলে। তাদের গুণও এক—দেশকে করে উর্ব্বর, আর তাদের লক্ষ্যও এক—মহাসাগরে মিলিত হওয়াই তাদের একমাত্র কামনা। সুতরাং মা কাজলরেখার বক্তব্যও ওই এক।

এবার কাজলরেখা ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

রাজা বিস্মিত হলেন। বললেন, তবে বল, শুনি তোমার কামনার কথা।

কাজলরেখা মৃদুস্বরে বললেন, আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি যেন হন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি রাজপুত্রও হতে পারেন, আবার অতি সাধারণ, এমন কি দীনদরিদ্রের সন্তানও হতে পারেন। কান্তিতে তিনি কন্দর্পতুল্যও হতে পারেন, আবার মহর্ষি অষ্টাবক্রের মত রূপহীনও হতে পারেন।—তিনি গুণে হবেন মহাজ্ঞানী। যেহেতু জ্ঞানই হ'ল প্রশান্তির একমাত্র আকর, এবং যেহেতু অন্তরের প্রশান্তির রশ্মিই হ'ল সৌম্যতা, সেইহেতু তিনি রূপহীন যদি হন, তবুও হবেন সৌম্যদর্শন এবং শান্তপ্রকৃতি। পুণ্য-কর্ম্মই হবে তাঁর অস্ত্র, ক্ষমাই হবে তাঁর ধর্ম্ম। মানুষকে তিনি জয় করবেন না, মানুষের সেবায় তিনি তাদের সেবক হবেন, মানুষই তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করবে বিজয়ী ব'লে। সাম্রাজ্য তিনি কামনা করবেন না, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যে তিনি মোহগ্রস্ত হবেন না, সাম্রাজ্য উথলে উঠবে তাঁর পদক্ষেপে, রাজপ্রাসাদ কাঁদবে তাঁর পদধূলির জন্য। তাঁর রক্ষী থাকবে না কেউ, যেহেতু জীবনই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় নয়, এবং সেইহেতুই তিনি হবেন মৃত্যুঞ্জয়। তিনি সামান্য ব্যক্তির মতই

সর্ব্বসাধারণের একজন হবেন, সেইহেতুই তিনি হবেন অসামান্য।

রাজা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁর কন্যা হয়ে এ কি বলছে কাজলরেখা! তার কথার মধ্যে সে বার বার রাজত্বকে তুচ্ছ করছে, রাজাকে হেয় করছে! তিনি বাধা দিয়ে বললেন, তোমার, মস্তিষ্কের বোধহয় ঠিক নাই কাজলরেখা। তাই বরাবর তুমি অসম্ভব কথা বলছ। রাজপুত্রকে কামনা না ক'রে সাধারণ মানুষকে বরণ করবার কথা বলছ।

কাজলরেখা বললেন, সাধারণের মধ্য থেকেই তিনি হবেন অসাধারণ।

রাজা বললেন, সাধারণ কখনও অসাধারণ হয় না। মুক্তামালার কথাই সত্য। বীজই সকল গুণের আকর। সুতরাং জন্ম যার উত্তমকুলে নয়, সে কখনও মহৎ বা শ্রেষ্ঠ বা অসাধারণ হতে পারে না।

কাজলরেখা বললেন, কন্যার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করবেন। আমি কিন্তু মনে করি অন্যরূপ। জন্ম থেকেও কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি। কর্ম্ম থেকেই মানুষের প্রতিষ্ঠা, মানুষের প্রতিষ্ঠা থেকেই হয় একটি বংশের প্রতিষ্ঠা। আবার সেই বংশের বংশধরের অপকর্ম্মে হয় সেই বংশের অধঃপতন। আপনার এই মহৎ বংশ—এই বংশের মহিমা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করছে পুণ্যকর্ম্মা উত্তরাধিকারীর উপর। উদ্ধত উগ্র ক্ষমাহীন প্রেমহীন উত্তরাধিকারী আপনার দৌহিত্র

হোক না কেন মাতৃকুলের দিকে তার আপনার বংশে জন্ম, হোক না কেন পিতার দিক থেকে অন্য কোন বড় রাজ-বংশে জন্ম, সে কখনও আপনার বংশমহিমা এবং কুলগরিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে পারবে না। বিধাতার লিপিও খণ্ডিত হয় মানুষের কর্ম্মফলে, সুতরাং আপনার ইচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদই আপনার উত্তরাধিকারীকে ভাবীকালে রক্ষা করতে পারবে না।

এই কথায় রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হলেন কাজলরেখার উপর। কেন না তাঁর মনে হ'ল কাজলরেখা তাঁর অপমান করেছে। রাজার পুত্রকে কামনা না ক'রে, সাধারণ মানুষকে কামনা ক'রে সে বংশের অপমান করেছে। তাঁর আশীর্ব্বাদ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করতে পারবে না ব'লে, সে তাঁর অপমান করেছে।

একবার তাঁর ইচ্ছা হ'ল, প্রহরীকে ডেকে এক্ষুনি এই হীনমতি কন্যাকে বন্দিনী ক'রে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।

তারপর একটা কথা তাঁর বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল। ভাল, তাই হবে। কাজলরেখা রাজ্যকে উপেক্ষা করে, সাধারণ মানুষকে বিবাহ করতে তার প্রবৃত্তি। তাই তিনি করবেন। সেই বিবাহই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। রাজকন্যা হয়ে সে গরীবের বউ হবে। দাস থাকবে না, দাসী থাকবে না, রাজভোগ পাবে না, মোটা কাপড় পরবে, নিজে ভাত রাঁধবে, ঘুঁটে দেবে, নিজে হাতে ঝাঁটা ধরবে—এই তো উপযুক্ত শাস্তি।

তিনি তাই স্থির ক'রে দুই কন্যার পাত্র সন্ধান করতে লাগলেন। মুক্তামালার বর খুঁজতে চারিদিকে রাজ্যে রাজ্যে রাজ-ঘটক গেল; আর গরীবদের ঘটকালি করে যারা, তাদের কয়েকজনকে ডেকে কাজলরেখার পাত্র সন্ধান করতে বললেন।

এই ঘটকদের মধ্যে এক বৃদ্ধ, তিনি বললেন, যদি অনুমতি করেন, তবে ছোটকন্যার মুখ থেকে একবার তাঁর কথা শুনতে চাই।

রাজা অনুমতি দিলেন। বুড়ো ঘটক রাজকন্যাকে প্রশ্ন করলেন, মা, কয়েকটি প্রশ্ন করব। মহাদেবের বয়সের গাছপাথর ছিল না—জান তো? তিনি শ্মশানে বাস করেন—জান তো? দেবতারা যখন অমৃত পান করেন, তখন তিনি বিষ পান করেন—জান তো? দক্ষ-রাজার কন্যা তাঁকে বিবাহ করার ফলে, দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল—জান তো?

কাজলরেখা বললেন, জানি।

বৃদ্ধ বললেন, তবে?

তবে? কাজলরেখা বললেন, বৃদ্ধ, আমি সতী কন্যা। আমার সংকল্প কখনও ভঙ্গ হয় না।

হ্যাঁ। বুঝলাম। তুমি সমস্ত কিছুই সহ্য করতে প্রস্তুত।

নিশ্চয়।

তারপর রাজ্যে এক মহা উৎসব আরম্ভ হল। মুক্তামালার বিবাহ। মহাসমারোহ ক'রে মুক্তামালার বিয়ে হ'ল এক রাজপুত্রের সঙ্গে। যেমন বর চেয়েছিলেন মুক্তামালা, তেমনই বর।

আর কাজলরেখা?

হ্যাঁ। তারপর একদিন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘটক নিয়ে এল এক বর। সাধারণ একটি লোক। এক দেশের এক কবি। গরীব, কিন্তু খুব পণ্ডিত। দেখতে মোটেই সুন্দর নন, কিন্তু মুখের হাসিটি বড় শান্ত। দেখলে মানুষও শান্তি পায়।

রাজা কন্যাদান করবার সময় ভেবেছিলেন, মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন, মুখ দেখবেন না।

হঠাৎ একবার দৃষ্টি পড়ল ছেলেটির মুখের দিকে। তার মুখের হাসিটি বড় ভাল লাগল। তিনি একবার ভাল ক'রে দেখলেন। আবার দেখলেন। কন্যাদান শেষ ক'রে উঠে একবার ভাবলেন, তাদের ডেকে ধনরত্ন দিয়ে তাদের আদর ক'রে নিজের কাছেই রাখবেন। কিন্তু না। নিজেকে কঠোর ক'রে তুললেন। কর্তব্য করতেই হবে। মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আজই রাত্রে তোমরা আমার রাজ্য থেকে চ'লে যাও। প্রভাতে যেন দেখতে না পাই। কেউ যেন জানতে না পারে।

কাজলরেখার বিয়ের কথা কাউকে জানান নি তিনি। —আলো জ্বলে নাই, বাজনা বাজে নাই, শুধু দুবার চারবার শাঁখ বেজেছিল। দুটি প্রদীপ জ্বলেছিল, তাও ঘর বন্ধ ক'রে।

অন্ধকারের মধ্যে বর আর কনে—কবি আর কাজলরেখা হাত ধরাধরি ক'রে, পায়ে হেঁটে, রাজ্য থেকে চ'লে গেল। যাবার সময় রাজা কিছু ধনরত্ন দিতে চাইলেন জামাইকে। জামাই বললেন, আমাকে ওসবের বদলে কিছু চাল দিন, যা নাকি রান্না ক'রে দশজনকে ভোজন করিয়ে, অবশিষ্টাংশ আমরা ভোজন ক'রে তৃপ্তি পাব। ধনরত্ন অলঙ্কার—এর মূল্য আমি বুঝি না।

কন্যা কাজলরেখা তাঁর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে বাপের পায়ের কাছে নামিয়ে দিলেন।

তারপর কবি আর কাজলরেখা এলেন কবির ঘরে।

গরীবের ঘর। কাজলরেখার তাতে কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। প্রসন্ন মনে সমস্ত করেন, ঝাঁট দেওয়া থেকে রান্নাবান্না বিছানা-পাতা, জল-আনা—সমস্ত।

কবি কাব্য লেখেন। রাত্রে কাজলরেখাকে শোনান। কাব্যে কবি ভগবানকে স্তব করেন, প্রার্থনা করেন, হে ভগবান, তুমি মঙ্গলময়, তুমি দীনদরিদ্রের বন্ধু, তাদের দুঃখ তুমি দূর কর। সকল বিপদে তুমি তাদের রক্ষা কর। তাদের বড় কষ্ট, তুমি তাদের দিকে তাকাও।

শুনতে শুনতে কাজলরেখার চোখ জলে ভ'রে ওঠে।

কবি সকালে বার হন একতারা নিয়ে। গ্রামের পথে পথে গান গেয়ে চলেন,—ধনী, তুমি অহঙ্কার ক'রো না, ধনসম্পদ হ'ল পদ্মপত্রের জল। দরিদ্র, তুমি দারিদ্র্যদুঃখে পরের হিংসা ক'রো না, অসৎ উপায়ে উপার্জ্জনের চেষ্টা ক'রো না; হিংসা হ'ল নিজের কাপড়ে ধরানো আগুন, তাতে তুমিই পুড়ে মরবে; অসৎ উপায়ে উপার্জ্জন হ'ল পাপ,—পাপ তোমাকে ধ্বংস করবে। উপরের দিকে চাও, সেখানে আছেন সকল মানুষের পরম বন্ধু এবং সকল রাজার রাজা; তিনি তোমাদের রক্ষা করবার জন্য, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ব'সে আছেন, সকল অবিচারের বিচার করবার জন্য ন্যায়দণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর দ্বারস্থ না হ'লে তিনি কি করবেন? তাঁর শরণ নাও, তাঁর শরণ নাও, তোমরা সকলে তাঁর শরণ নাও।

এদিকে, রাজা মুক্তামালার বরকে তাঁর প্রতিনিধি ক'রে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মুক্তামালার বর মহাবীর, মহাযোদ্ধা, তিনি মৃগয়ায় যান, পশুপক্ষী বধ করেন, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দেশ জয় করেন। রাজাদের বন্দী ক'রে এনে দাস করেন, রাণী আর রাজকন্যাদের এনে মুক্তামালার দাসী ক'রে দেন।

আবার তিনি কঠোর শাসক। সামান্য দোষও কেউ

করলে তার নিষ্কৃতি নাই। চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন। কে কোথায় রাজার নিন্দা করছে, সন্ধান রাখে গুপ্তচরেরা। কে কোথায় রাজার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করছে, সে সন্ধান রাখে তারা। জামাই-রাজা কঠোর শাস্তি দেন।

প্রজারা সভয়ে সশঙ্কিত হয়ে দিন যাপন করে। কার কোন্‌দিন কি হয়! শস্য উঠলে সর্ব্বাগ্রে রাজার কর আদায় দেয়, শস্য যদি নাও হয়, তবুও ঋণ ক'রে অথবা কিছু বিক্রী ক'রে যেমন ক'রেই হোক, রাজার কর দিয়ে আসে।

ক্রমে তুই কন্যারই তুটি ছেলে হ'ল। ছেলে তুটি আপন আপন বাপ-মায়ের কাছে বড় হতে লাগল।

মুক্তামালার ছেলে, ভবিষ্যৎ রাজা, রাজপ্রাসাদে সোনার ভঁাটা নিয়ে খেলা করে। তীর ধনুক নিয়ে পোষা-পাখী বিঁধে লক্ষ্যভেদ শেখে।

আর কাজলরেখার ছেলে ভোরে উঠে জোড়হাত ক'রে বসে, কাজলরেখার সঙ্গে তার বাপেব রচনা কবা ভগবানের স্তব গান কবে, আঙিনায় খেলা করে, পাথর নুড়ি কুড়িয়ে আনে। যেগুলি ময়লা মাটি লেগে থাকে, সেগুলিকে বলে, মা, এরা গরীব-তুঃখী, নয়? গায়ে ময়লাটি লেগে রয়েছে।

তাদের সে স্নান করায়। বলে, এদের সেবা করছি। সন্ধ্যায় সে শাস্ত্র পড়ে বাপের কাছে—নানা শাস্ত্র।

এমন সময়, সেবার একবার দেশে এল মহা হাহাকার। একেবারেই বৃষ্টি হ'ল না। দারুণ অনাবৃষ্টি। বর্ষা না হ'লে শস্য হয় না, শস্য না হ'লেই দেশে হয় তুর্ভিক্ষ। দেশে তুর্ভিক্ষ

উপস্থিত হ'ল। লোকে অন্নের অভাবে, গাছের পাতা খেতে আরম্ভ করলে। স্ত্রী-পুত্র বেচতে আরম্ভ করলে।

জামাই-রাজার কঠোর শাসন। রাজকর আদায়ের জন্য নায়েব-গোমস্তার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত দেওয়া হ'ল।

কাজলরেখার স্বামী কবি, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে অবিরাম কাঁদেন। ভগবানকে ডাকেন, উপায় কর, প্রভু, তুমি উপায় কর। মানুষকে তুমি রক্ষা কর।

কাজলরেখা জোড়হাত ক'রে ব'সে থাকেন স্বামীর পাশে। ছেলেটিও থাকে।

রাত্রে কবিকে স্বপ্নাদেশ হ'ল। এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি পুরুষ এসে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ দেশে রাজা রয়েছে। তুমি প্রজাদের সঙ্গে ক'রে তাঁর দরবারে যাও—জানাও তাঁকে তোমাদের দুঃখের কথা। তিনি যদি প্রতিকার না করেন, তখন আমার কাছে নালিশ জানালে তার প্রতিকার আমি করব।

সকালে উঠেই কবি কাজলরেখাকে সব বললেন। ব'লে বললেন, দেখ, তোমার দিদি মুক্তামালার স্বামীর যে প্রকৃতির কথা আমি শুনেছি, তাতে ভগবানের অভিপ্রায় যে কি তা আমি বুঝতে পারছি না। তবু আমাকে যেতে হবে। সত্যপ্রিয় (ছেলের নাম সত্যপ্রিয়) তোমার কাছে রইল। আমি যদি না ফিরি, তবে তার ভার তোমার উপর রইল।

তারপর তিনি দুঃখীদের নিয়ে রাজধানীতে গেলেন।

যত যান, তত দলে দলে লোক তাঁর পাশে জমা হয়। এমনই ভাবে তারা প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে জোড়হাত ক'রে ডাকলে, হে মহারাজ, আমাদের দয়া করুন, আমাদের অন্ন দিন।

মুক্তামালার স্বামী ঘুমুচ্ছিলেন।

চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বেরিয়ে এলেন বারান্দায় রক্ত চক্ষু হ'য়ে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে। বিছানা থেকে তরবারি হাতে নিতেই কিন্তু চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, সম্ভবত তারা তাঁর তরবারি হাতে নেওয়া জানতে পেরেছে। কিন্তু তিনি বারান্দায় এসে দেখলেন, শক্তিপ্রিয়—(তাঁর ছেলের নাম শক্তিপ্রিয়), তারই ভয়ে প্রজাদের চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে; শক্তিপ্রিয় ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে, আর নীচে প্রজাদের সামনে, সর্ব্বাগ্রে একটি মানুষের দেহ প'ড়ে আছে। তার বুকে একটা তীর ব'সে রয়েছে। দেখেই ছেলেকে তিনি মহাগৌরবের সঙ্গে বুকে তুলে নিলেন। উপযুক্ত পুত্র। উদ্ধত প্রজার বিদ্রোহ দমন করতে সে পারবে।

এদিকে খবর পেয়ে মাতাপুত্রে হাতজোড় ক'রে ভগবানকে ডাকলেন। বললেন,—প্রভু, তোমার আদেশে সে গিয়েছিল। তাকে রাজা বধ করেছে। তার প্রতিহিংসা আমরা চাই না, আমরা চাই, তুমি বলেছিলে রাজা প্রতিকার না করলে তখন তোমার কাছে নালিশ জানাতে। রাজা প্রতিকার করে নাই, তুমি এইবার প্রতিকার কর, দুঃখীদের বাঁচাও, ত্রাণ কর।

এইবার ভগবানের আসন ট'লে উঠল। তিনি ডাকলেন ক্ষোভকে। বায়ুর মধ্যে যে ক্ষোভ থাকে সে এল। বললে, আমার অন্তরের সকল রস যখন সূর্য্য হরণ করে তখন আমি জেগে উঠি, বাতাসকে করে তুলি ঝড়। মেঘ আসে আমার সঙ্গে—সে সূর্য্যকে ঢেকে ফেলে। জলের মধ্যে যে ক্ষোভ থাকে সে এল। বললে, ঝড় যখন আমাকে আঘাত করে তখন তাকে প্রতিহত করবার জন্য আমি জাগি সমুদ্রের তরল তরঙ্গে। মাটির মধ্যে থাকে যে ক্ষোভ সেও এল। সে বললে, মৃত্তিকাকে যখন উত্তপ্ত করে তোলে আর যখন সহ্য হয় না, তখন আমি জাগি, আমার সঞ্চরণে মাটি তখন কাঁপে ভূমিকম্পে।

ভগবান বললেন, তোমাদেরই আমি চাই। অন্যায়ের ঔদ্ধত্যের প্রতিকারের জন্যই তোমরা সৃষ্ট হয়েছ। ঈর্ষার অন্যায় তোমাদের মধ্যে নাই।

যাও, তুমি গিয়ে প্রজাদের বুকের মধ্যে অধিষ্ঠান হও, দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠ, তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে এমনভাবে তাদের ক্ষুব্ধ ক'রে তোল।

ক্ষোভ এল। অনাহারে মানুষ পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল পেটের জ্বালায়। অপমানবোধ ছিল না, অধিকারবোধ ছিল না, পশুর মত উচ্ছিষ্ট খুঁজে, অখাদ্য খুঁজে, ঘুরে বেড়াচ্ছিল ধনীর দুয়ারে, নগরের পথে, পথে বনে-প্রান্তরে। পথেই প'ড়ে তারা মরছিল। সেই সব মড়ার মাংস খাচ্ছিল অপর সকলে। তাদের অন্তরে ক্ষোভ এসে জাগল। মনের মধ্যে প্রশ্ন উদিত হ'ল, কেন আমরা এমন ভাবে না খেয়ে মরব ?

উত্তর দিলে সত্যপ্রিয়,---বললে, প্রশ্ন কর রাজাকে, যিনি প্রজাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন, যিনি এর জন্য কর নিয়ে থাকেন।

দলে-দলে মানুষ এসে সংঘবদ্ধ হয়ে এক বিরাট জন-সমুদ্রের সৃষ্টি করলে। তারা দেখতে দেখতে অন্যরকম হয়ে উঠল। দক্ষযজ্ঞের সময় শিবের জটা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন বিরূপাক্ষ, তেমনই মূর্ত্তি হ'ল তাদের। তারা ছুটল দলে দলে, মার্-মার্ শব্দে। মার্, ওই রাজাকে মার্! ওই রাজাকে মার্। রাজার পাপেই হয় অনাবৃষ্টি, রাজার পাপেই হয় দুর্ভিক্ষ, রাজার অত্যাচারেই আমাদের এই দশা। রাজাকে মার্।

সত্যপ্রিয় পিছনে পিছনে ছুটল। না-না-না। এরূপ নয়। এরূপ নয়। শান্ত হও। শান্ত হও। শান্ত, ধীর পদক্ষেপে চল। অশান্ত অধীর হিংস্র হয়ে উঠো না তোমরা।

কিন্তু সেকথা তাদের কানে ঢুকল না। জনতার কোলা-হলের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল।

তারা ছুটে গিয়ে পড়ল দলে দলে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা ক্ষেপে উঠল, হাতি ক্ষেপে উঠল, ঘোড়া ক্ষেপে উঠল। আকাশে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল বাজপক্ষী, শকুনি, গৃধিনী; সে এক প্রলয়ের ব্যাপার! ভেঙে পড়ল রাজার সিংহদ্বার। ছিঁড়ে পড়ল ঝাড়-লণ্ঠন। দাউদাউ ক'রে জ্বলতে লাগল কাঠের আসবাব। প্রজারা হুঙ্কার দিয়ে উঠতে লাগল।

মুক্তামালার বর কিন্তু মহাবীর, শক্তিপ্রিয়ও বীর,—মুক্তা মালাও যুদ্ধ করতে জানেন। তাঁরা পালালেন না, যুদ্ধ করতে এলেন। কিন্তু এত মানুষের কাছে তাঁরা কি করবেন? কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

প্রজারা তাদের দেহ মাড়িয়ে এর পর ছুটল—কোথায় সেই বুড়ো রাজা। এইবার তাকে আমরা বধ করব। কোথায় সে?

অথর্ব্ব বৃদ্ধ রাজা ব'সে ছিলেন আপনার ঘরে। তিনি ইষ্ট স্মরণ করতে লাগলেন। কোলাহল এগিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু রাজা আশ্চর্য্য হলেন, হঠাৎ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। বাঁশির আওয়াজের মত একটি মিষ্ট আওয়াজ তাঁর কানে এল—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, হিংসাকে সম্বরণ কর।

বাঁশির আওয়াজ শুনে দংশনোদ্যত অজগর যেমন থমকে দাঁড়িয়ে যায়, পাগলা হাতি যেমন শান্ত হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই পাগল লোকেরা থেমে গেল। রাজার ঘরে এসে ঢুকল যোল-সতেরো বৎসরের একটি ছেলে, সে যেন কুমার কার্ত্তিক। কিন্তু তার হাতে ধনুর্ব্বাণ নাই, অঙ্গে রাজবেশ নাই। পিছনে পিছনে এসে ঢুকলেন বিধবা কাজলরেখা।

বাবা!

রাজা চমকে উঠলেন, মা কাজলরেখা?

হ্যাঁ, বাবা। এই আপনার দৌহিত্র।

জামাই ?

তাঁকে তো বধ করেছে শক্তিপ্রিয়।

রাজা কাঁদতে লাগলেন।

কাজলরেখা বললেন, বাবা, জন্ম থেকে শ্রেষ্ঠ হ'ল কর্ম্ম, তাই সেই কর্ম্মপুণ্যবলে মানুষের সেবার পুণ্যে উন্মত্ত মানুষও আজ সত্যপ্রিয়ের অনুগত। সেই পুণ্যে আপনাকে আজ রক্ষা করতে পেরেছি, এই আমার মহাভাগ্য।

রাজা উঠলেন, নিজের মাথার মুকুট খুলে পরিয়ে দিলেন সত্যপ্রিয়ের মাথায়।

প্রজারা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। রাজা বললেন, আমার রাজকোষ রাজভাণ্ডার তোমাদের খুলে দিলাম।

সত্যপ্রিয় মাথার মুকুট খুলে প্রজাদের পায়ের তলায় রেখে দিয়ে বললেন,—এও তোমাদের।



ধার্ম্মিকের পরীক্ষা

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাকর্ম্মী, মহা-ভাগ্যবান। জ্যোতির্ম্ময় ললাট, সৌভাগ্যলক্ষ্মী স্বয়ং ললাট-মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্ম্ম ছিল মহৎ এবং প্রতি কর্ম্মেই ছিল সাফল্য, কারণ, যশোলক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর কর্ম্ম-শক্তিতে। তাঁর কুল ছিল অকলঙ্ক, পত্নী-পুত্র-কন্যা-বধূর গৌরবে অকলঙ্ক কুল উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছিল—কারণ, কুললক্ষ্মী তাঁর কুলকে আশ্রয় করে ছিলেন যশোলক্ষ্মীর অনুসরণ ক'রে।

পাপ অহরহ ঈর্ষ্যাতুর অন্তরে ব্রাহ্মণের বাসভূমির চারিদিকে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সহ্য হয় না ব্রাহ্মণের এই পুণ্যবল।

বহু চিন্তা ক'রে সে একদিন সঙ্গে ক'রে আনলে অলক্ষ্মীকে। বাড়ীর বাইরে থেকে ব্রাহ্মণকে ডাকলে।

ব্রাহ্মণ বললে—কি চাও, বল ?

পাপ বললে—আমি বড় দুর্ভাগা, দুঃখ কষ্টের সীমা নাই। আমার সঙ্গিনীটিকে আপনি আশ্রয় দিন—এই আমার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি গৃহস্থ ; আশ্রয়প্রার্থী দুঃস্থকে আশ্রয় দেওয়া আমার ধর্ম্ম। বেশ, থাকুন উনি। বধূ-কন্যার মতই যত্ন করব। ইচ্ছা হ'লে যতদিন দুর্ভাগ্যের শেষ না হয়, ততদিন তুমিও থাকতে পার। এস, তুমিও এস।

আহ্বান সত্ত্বেও পাপ কিন্তু পুরপ্রবেশ ক'রতে সাহস করলে না, কারণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় ক'রে রয়েছেন ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে রয়েছেন পুণ্যময়ী লক্ষ্মী। ওঁরা দুজ'ন যেখানে থাকেন, পাপের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

যাক, অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বিপর্য্যয় ঘটল।

ফলবান বৃক্ষ-গুলির ফল যেন নীরস হয়ে গেল, ফুল ম্লান হ'ল। রাত্রে ব্রাহ্মণ জপ করছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন কার করুণ কান্না। বিস্মিত হয়ে জপ শেষ ক'রে উঠতেই তিনি দেখলেন—তাঁরই ললাট থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতি, সেই জ্যোতি ক্রমে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি ধারণ করলে। তিনিই এতক্ষণ কাঁদছিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন—কে মা তুমি ?

—তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী। এতদিন তোমার ললাট আশ্রয় ক'রে ছিলাম, আজ আমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তাই কাঁদছি।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—একটা প্রশ্ন করব মা। আমার অপরাধ কি হ'ল ?

তুমি আজ অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ। ওই মেয়েটি অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মী এবং আমি তো একসঙ্গে বাস ক'রতে পারি না।

ব্রাহ্মণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। লক্ষ্মীকে প্রণাম করলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না।

সকালে দেখলেন, বৃক্ষের ফল খ'সে গেছে, ফুল শুকিয়ে গেছে। সরোবর হয়েছে ছিদ্রময়ী, জল সেই ছিদ্রপথে অদৃশ্য হয়েছে। ভূমি শস্যহীনা, গাভী দুগ্ধহীনা। গৃহ হয়েছে শ্রীহীন।

রাত্রে আবার সেই রকম কান্না।

আবার দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন—এক দিব্যাঙ্গনা। তিনি বললেন—আমি তোমার যশোলক্ষ্মী। ভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, অলক্ষ্মীকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, সুতরাং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ নীরবে তাঁকে প্রণাম ক'রলেন; তিনি চ'লে গেলেন।

পরদিন তিনি শুনলেন, লোকে বলছে—ব্রাহ্মণ লম্পট, ওই যে মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে তার দিকে তার কু-দৃষ্টি পড়েছে।

তিনি প্রতিবাদ করলেন না।

সেদিন রাত্রে আর এক নারীমূর্ত্তি তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁর কুললক্ষ্মী। বললেন—অলক্ষ্মী

এসেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী চ'লে গেছেন, যশোলক্ষ্মী চ'লে গেছেন, লোকে তোমার কলঙ্ক রটনা করছে, আমি কুললক্ষ্মী, আর কেমন ক'রে থাকি তোমায় আশ্রয় ক'রে ?

তিনিও চলে গেলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণের দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন আর এক মূর্ত্তি। নারী নয়—পুরুষমূর্ত্তি। দিব্য ভীমকান্তি, জ্যোতির্ম্ময় রূপ।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে ?

দিব্যকান্তি পুরুষ ব'ললেন—আমি ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম ? আপনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রছেন কোন্ অপরাধে ?

অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি।

সে কি আমি অধর্ম্ম করেছি ?

ধর্ম্ম চিন্তা ক'রে বললেন—না।

তবে ?

ভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ত্যাগ করেছেন।

আশ্রয়প্রার্থী বিপদগ্রস্তকে আশ্রয় দেওয়া যখন অধর্ম্ম নয়, তখন আমার অধর্ম্মের জন্য তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নি,—পরিত্যাগ করেছেন অলক্ষ্মীর সংস্পর্শ সইতে না পেরে।

হ্যাঁ।

ভাগ্যলক্ষ্মীকে অনুসরণ করেছেন যশোলক্ষ্মী, তাঁর পেছনে গেছেন কুললক্ষ্মী, আমি প্রতিবাদ করি নি। ওই তাঁদের পন্থা। কিন্তু আপনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন কোন্ অপরাধে ?

ব্রাহ্মণ বললেন—আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না; কারণ আপনাকে অবলম্বন ক'রে আমি বেঁচে রয়েছি। আপনাকে আমি যেতে না বললে আপনার যাবার অধিকার নাই। আমিই আপনার অস্তিত্ব।

ধর্ম্ম স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন, নিজের ভ্রম বুঝলেন; তারপর ব্রাহ্মণকে ব'ললেন—তথাস্তু। তোমার জয় হোক।

...ব'লে তিনি আবার ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হ'লেন।

তারপর সংক্ষিপ্ত কথা। ধর্ম্মের প্রভাবে সেইদিন রাত্রে উঠল আবার এক ক্রন্দনধ্বনি; ব্রাহ্মণ দেখলেন সেই অলক্ষ্মী মেয়েটি এসে বলছে—আমি যাচ্ছি। আমি চললাম।

ব্রাহ্মণ ব'ললেন, তুমি স্বেচ্ছার বিদায় চাও?

হঁ্যা, স্বেচ্ছায়। স্বেচ্ছায় যাচ্ছি।

সে মিলিয়ে গেল।

সেই দিন রাত্রেই ফিরলেন ভাগ্যলক্ষ্মী। তারপর এলেন যশোলক্ষ্মী, তারপর কুললক্ষ্মী।

সেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মবলে আবার আপন সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পুত্র-কন্যা-জামাতায়, পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে সংসার হয়ে উঠল দেববৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়। ফলে অমৃতস্বাদ গুণ, ফুলে অগুরু-চন্দনকেও লজ্জা দেয় এমন গন্ধ; কোনও ফল

অকালে চ্যুত হয় না, ফুল অকালে শুষ্ক হয় না। তাঁর পরিপূর্ণ সংসার, আনন্দে শান্তিতে সুখে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল! পুত্রেরাও প্রত্যেকে বড় বড় পণ্ডিত, জামাতারাও তাই। প্রত্যেকেই দেশ-দেশান্তরে স্বকর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কোন রাজার কুলপণ্ডিত, কেউ সভাপণ্ডিত, কেউ বড় টোলের অধ্যাপক। ব্রাহ্মণ আপন গ্রামেই থাকেন, আপন কর্ম্ম করেন। একদিন তিনি হাটে গিয়ে হঠাৎ এক মেছুনীর ডালার দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন। মেছুনীর ডালার একটি কালো রঙের সুডৌল পাথর, গায়ে কতকগুলি চিহ্ন। পাথর নয়, নারায়ণশিলা—শালগ্রাম। মেছুনীর ওই অপবিত্র ডালায় আমিষগন্ধের মধ্যে পূত নারায়ণ-শিলা!

তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মেছুনীকে বললেন—মা, ওটি তুমি কোথায় পেলে?

মেছুনী একগাল হেসে প্রণাম ক'রে বললে—বাবা, ওটি নদীর ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছি। ঠিক এক পো ওজন, বাট্‌খারা করেছি ওটিকে। ভারী পয় আমার বাটখারাটির। যেদিন থেকে পেয়েছি, সেদিন হ'তে আমার বাড়-বাড়ন্তর আর সীমা নাই।

সত্য কথা। মেছুনীর এক-গা সোনার গহনা।

ব্রাহ্মণ বললেন, দেখ মা, এটি হ'ল শালগ্রামশিলা। ওই আমিষের মধ্যে এঁকে রেখে দিয়েছ, ওতে তোমার মহা-অপরাধ হবে।

মেছুনী হেসেই সারা।

ব্রাহ্মণ বললেন—ওটি তুমি আমায় দাও। আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি। পাঁচ টাকা দিচ্ছি তোমাকে।

মেছুনী বললে—না বাবা, এটি আমি বেচব না।

বেশ, দশ টাকা নাও।

না বাবা-ঠাকুর। ও আমায় অনেক দশ টাকা পাইয়ে দেবে।

বেশ, কুড়ি টাকা।

না বাবা! তোমাকে যোড়-হাত করছি।

আচ্ছা, পঞ্চাশ টাকা।

হবে না।

একশো।

না গো, না।

এক হাজার।

মেছুনী এবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না; দিতে পারলে না।

পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি তোমায়।

এবার মেছুনী আর লোভ সংবরণ করতে পারলে না।

ব্রাহ্মণ তাকে পাঁচটি হাজার টাকা গুনে দিয়ে নারায়ণকে এনে গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, সে দিন রাত্রে ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখলেন একটি জ্যোতির্ম্ময় দুরন্ত কিশোর তাঁকে বলছে—আমাকে কেন তুমি মেছুনীর ডালা থেকে নিয়ে এলে? আমি সেখানে বেশ ছিলাম। যাও, এখুনি ফিরিয়ে দিয়ে এস আমাকে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হ'লেন।

দ্বিতীয় দিনেও আবার সেই স্বপ্ন।

তৃতীয় দিনের দিন স্বপ্নে দেখলেন কিশোরেব ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি। বললেন—আমায় ফিবিয়ে দিয়ে এস, নইলে কিন্তু তোমারসর্ব্বনাশ হবে।

সকালে উঠে সেদিন তিনি গৃহিণীকে সব বললেন।

গৃহিণী উত্তর দিলেন—তাই ব'লে নারায়ণকে পরিত্যাগ করবে নাকি? যা হয় হবে। ও চিন্তা তুমি ক'রো না।

রাত্রে আবার সেই স্বপ্ন—আবার—আবার।

তখন তিনি পুত্র-জামাতাদের এই স্বপ্ন-বিবরণ লিখে জানতে চাইলেন তাঁদের মতামত।

মতামত এল। সকলেরই এক জবাব—গৃহিণী যা বলে ছিলেন তাই।

সেদিন রাত্রে স্বপ্নে তিনি নিজে উত্তর দিলেন—ঠাকুর, কেন তুমি রোজ এসে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত কর বল তো? কাজে-কর্ম্মে-বাক্যে-চিন্তায় আমার জবাব কি তুমি আজও পাও নি? আমিষের ডালায় তোমাকে আমি রেখে দিতে পারব না।

পরের দিন ব্রাহ্মণ পূজা শেষ ক'রে উঠে নাতি-নাতনীদের ডাকলেন—প্রসাদ নেবার জন্যে। সকলের ছোট যেটি, সেটি ছুটে আসতে গিয়ে অকস্মাৎ হোঁচোট খেয়ে পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাকে তুললেন; কিন্তু তখন শিশুর দেহে আর প্রাণ নাই। মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। ব্রাহ্মণ অচঞ্চল হয়ে শুধু একটু হাসলেন।

রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন সেই কিশোর নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললে—এখনও বুঝে দেখ। জান তো, "সর্ব্বনাশের হেতু যার, আগে মরে নাতি তার!"

ব্রাহ্মণ নীরবে হাসলেন।

তারপর অকস্মাৎ সংসারে আরম্ভ হয়ে গেল মহামারী। একটির পর একটি—'একে একে নিভিল দেউটি'। আর রোজ রাত্রে একই স্বপ্ন।

রোজই ব্রাহ্মণ নীরবে হাসেন।

একে একে সংসারের সব শেষ হয়ে গেল! অবশিষ্ট রইলেন—ব্রাহ্মণ নিজে আর—ব্রাহ্মণী।

আবার স্বপ্ন দেখলেন, এখনও বুঝে দেখ—ব্রাহ্মণী থাকতে।

ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি বড় ফাজিল হে ছোকরা, তুমি বড়ই বিরক্ত করছ আমাকে।

পরদিন ব্রাহ্মণীও গেলেন।

আশ্চর্য্য, সেদিন আর রাত্রে কোনও স্বপ্ন দেখলেন না।

ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি শেষ ক'রে, একটি ঝোলায় সেই শালগ্রাম-শিলাটিকে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, নদ-নদী-বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে চললেন।

পূজার সময় হ'লে একটি স্থান পরিষ্কার ক'রে বসেন, ফুল তুলে পূজা করেন, ফল আহরণ ক'রে ভোগ দেন—প্রসাদ পান।

অবশেষে একদা তিনি মানস-সরোবরে এসে উপস্থিত হলেন। স্নান করলেন—তারপর পূজায় বসলেন। চোখ বন্ধ

ক'রে ধ্যান করছেন, এমন সময় দিব্যগন্ধে স্থান পরিপূর্ণ হয়ে গেল—আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ ক'রে বাজতে লাগল দেব-দুন্দুভি। কে যেন তাঁর প্রাণের ভিতর ডেকে বললে—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি।

চোখ বন্ধ ক'রেই ব্রাহ্মণ বললেন—কে তুমি?

আমি নারায়ণ।

তোমার রূপটা কেমন বল তো?

কেন, চতুর্ভুজ। শঙ্খ চক্র—

উহুঁ, যাও। যাও, তুমি যাও।

কেন?

আমি তোমায় তো ডাকি নি?

তবে কাকে ডাকছ?

সে এক ফাজিল ছোকরা। যে প্রায়ই এসে স্বপ্নে আমায় শাসাত, তাকে চাই।

এবার সেই স্বপ্নের ছোকরার গলা তিনি শুনতে পেলেন—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি।

চোখ খুলে ব্রাহ্মণ এবার দেখলেন—হাঁ, সেই তো বটে।

কিশোর হেসে বললেন—এস আমার সঙ্গে।

ব্রাহ্মণ আপত্তি করলেন না, বললেন—চল। তোমার দৌড়টাই দেখি।

কিশোর দিব্যরথে চড়িয়ে তাঁকে এক অপূর্ব্ব পুরীতে এনে বললেন—এই তোমার পুরী।...পুরীর দ্বার খুলে গেল; সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সেই সকলের ছোট নাতিটি যে সর্ব্বাগ্রে মারা গিয়েছিল। তার পিছনে-পিছনে আর সব।



বিধাতা ও মানুষ

আদিকালের গল্প বলছি।

ইতিহাসের আদিকাল নয়, রূপকথার সেই আদিকাল। এখন তো কলিকাল—তখন হল সত্যযুগের প্রথম। বিধাতা মনের আনন্দে আপনার কারখানায় বসে সূর্য্য তৈরী করছেন, চন্দ্র তৈরী করছেন, গ্রহ তৈরী করছেন, নক্ষত্র তৈরী করছেন, আর তাদের মধ্যে স্থাপন করছেন আপনার অংশ থেকে নিয়ে এক এক দেবতা; সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—আরও অনেক···অনেক···অনেক···। সৃষ্টি করে সৃষ্টিতে সৃষ্টিতে অসীম অখণ্ড আকাশ ভরে দিলেন। ঝলমল করতে লাগল তাঁর চোখের সামনে তাঁর সৃষ্টি। আলো, আলো আর আলো। কারও জ্যোতি রক্তাভ, কারও নীলাভ, কারও বা জ্যোতি শুভ্র। দেখলেন তিনি চোখ ভরে।

আপন আপন আলো দিয়ে তাঁর আরতি করছে সকলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল বটে তবু যেন ভরল না। মনে হ'ল, কোথায় যেন খুঁত রয়েছে। ভাবতে লাগলেন তিনি, ভাবতে ভাবতে মন উদাস হয়ে গেল। উদাস হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুকে যেন অনুভব করলেন একটা বেদনা। সে বেদনা তিনি যেন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তখন তিনি অধীর হয়ে নিজের বুক চিরে বের করে ফেললেন সে বেদনাকে। তাঁর হৃদয়ের একটুখানি জায়গা যেন স্ফীত হয়ে উঠেছিল। হৃদয়ের সেই অংশটুকু আপনিই তাঁর হাতে খসে পড়ল যেমন নাকি খসে পড়ে কস্তুরীহরিণের সুপরিপক্ক নাভি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভরে গেল জলে, বুক থেকে ঝরে পড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস। সে নিশ্বাস এমনই দীর্ঘ যে তাতে বাঁশীর মত সুর বেজে উঠল। হৃদয়ের সেই অংশটুকু চোখের জলে ভিজল, আর সেই সুর ওঠানো দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় শুকালো। আর তার সর্ব্বাঙ্গে লেগে থাকল বিধাতাব হাতের তালুর ছাপ। দেখতে দেখতে এক নূতন সৃষ্টি হয়ে গেল। এই হ'ল পৃথিবী।

দেখে বিধাতার চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। আহা এ কি অপরূপ শোভা! নীলাভ নয়, রক্তাভ নয়, সাদা নয়,—ঘন সবুজ তার রঙ। কোন জ্যোতি তার নাই, কিন্তু সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের আলো তার উপর পড়ে বহু জ্যোতিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তাকে রামধনুর হার পরিয়ে। বহু রঙের বৈচিত্র্যে ভরে দিয়েছে তার সর্ব্বাঙ্গ।

এখন সমস্যা হল—এই যে অপরূপ সৃষ্টিটি, এর দেবতা হবে কে ?

বিধাতার ছোট্ট মেয়েটি ঠিক সেই সময় যাচ্ছিল তাঁর সামনের উঠান দিয়ে। সে এই নূতন সৃষ্টিটি দেখে অবাক হয়ে গেল, কোথায় যাচ্ছিল ভুলে গিয়ে বাপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—আমাকে এটি দেবে বাবা ?

বিধাতা চমকে উঠলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল একটা কথা। বললেন—সত্যি, নিবি তুই ?

—হ্যাঁ নেবো।

—বেশ্ তবে তুমিই হও এর দেবতা।

ব'লে তাঁর সেই ছোট্ট মেয়েটিকে পৃথিবীর বুকে স্থাপন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিলেন।

বিধাতার মেয়ে চীৎকার করে বল্লে—বাবা আমি যে থাকতে পারছি না। আমায় কিছু দাও। —খেলব কি নিয়ে ?

বিধাতা গড়ে দিলেন গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জলচর, খেচর, ভূচর, হাঙ্গর, তিমি, মাছ, পাখী, পশু, নানা আকারের, নানা প্রকৃতির। মহাবলে দিলেন মহাগজ, মহাসিংহ, মহাব্যাঘ্র, মহাগণ্ডার। বড় বড় গাছের মাথায় সাজিয়ে দিলেন বিরাট বিরাট পাখী। পাহাড়ে দিলেন মহাসর্প, যাকে বলে অজগর, যারা চলে গেলে গায়ের ধাক্কায় খসে পড়ে হুড়মুড় করে পাথরের চাঙড়। সমুদ্রে দিলেন তিমি, হাঙর, কুমীর।

বললেন—কি মা, খেলনা মনোমত হয়েছে তো ?

মেয়ে বললেন—ভালো হয়েছে, কিন্তু—

—কিন্তু কি মা ?

—বুঝতে পারছি না বাবা।

সত্যিই বুঝতে পারছিলেন না বিধাতার মেয়ে। গাছে গাছে কত ফুল, কত রঙ, কত গন্ধ! পাখীর পালকে কত রঙ, তাদের ডাকে কত সুর, তাদের পায়ে কত নাচের ছন্দ, প্রজাপতির ডানায় কত ছবি—কত লেখা; সিংহের কেশরে কত শোভা, বাঘের গায়ে কত চিত্র বিচিত্র, হরিণের চোখে কত মাধুরী, হাতীর দাঁতে, শুঁড়ে, আকারে কত বিপুলতা, তিমির পাখনার আকারে কত বিস্ময়, ঘাসে ফসলে কি সে ঘন সবুজ, সমুদ্রের জলে কত নীল, পাহাড়ের চূড়ায় বরফে সে কি শুভ্রতা, নদীর জলে কত ঢেউ, মরুভূমির বালিতে সে কি ঝিকিমিকি,—তবু বিধাতার মেয়ের মন ভরছে না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সৃষ্টি করে, ঝলমলে আকাশের দিকে চেয়ে যেমন বিধাতার মন ভরেনি, কেমন উদাস হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনটিই হয়েছে বিধাতার মেয়ের মন। চোখ ভরে তাঁর জল আসছে, বুকের ভিতরটায় যেন একটা বেদনা ঘনিয়ে উঠছে, টনটন করছে।

বিধাতা বললেন—হয়েছে মা, হয়েছে। আমারও ঠিক এমনি হয়েছিল, তোমার ঐ খেলাঘর, যার তুমি দেবতা, ওই পৃথিবী গড়বার আগে। বুকের ভিতর থেকে বেদনাটুকু বার করে ফেল, তাতে চোখের জল মেশাও, তার সঙ্গে

মেশাও পৃথিবীর খানিকটা টুকরো, তারপর গড়ে নাও তোমার মন যেমন চায় তেমনি খেলনা।

বিধাতার মেয়ে তাই করলেন। মিশিয়ে অদ্ভুত কাদার মত তাল করে ভাবতে লাগলেন কি গড়বেন। মনে পড়ল তাঁর বাপকে, মাকে, জলের আয়নায় দেখা নিজের চেহারাকে। অবিকল গড়লেন তেমনি পুতুল। তারপব বাপকে ডেকে বললেন,—বাবা তুমি এদের জীবন্ত করে দাও। এরাই হবে আমার সব চেয়ে আদরের খেলনা, আমার ছেলে।

বিধাতা নিজের তেজ দিলেন, বুদ্ধি দিলেন, মন দিলেন জিভে কথা বলবার কৌশল দিলেন।

বললেন—আমার মেয়ের সব চেয়ে আদরের তোমরা, তোমাদের দিচ্ছি আমার যে যে ক্ষমতা আছে তার সব কিছু অংশ।

এই এরাই হল মানুষ। ক্ষুদে বিধাতার দল। পৃথিবীর বুকে সমুদ্র, পাহাড়, বন, নদী, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী, ফুল-পাতা, লাল-নীল–সবুজ-সাদা রূপের হাটের মধ্যে অপরূপের দল ছড়িয়ে পড়ল ;—বর্ষার ঘনঘটাভরা শস্য ভরা পৃথিবীর বুকে শরতকালের ঝলমলে আলোর মত, বসন্তকালের কচি পাতায় ভরা ডগায়-ডগায় ফুলের মত।

বিধাতার মেয়ে, পৃথিবীর দেবতা, আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বাপকে বললেন—পেয়েছি বাবা, পেয়েছি। আমার মন ভরে গিয়েছে।···হাসিতে গানে নাচে ভরে গেল পৃথিবী।

মানুষ ছেলেরা শুধু হাসেই না, শুধু গানই করে না শুধুই নাচে না,—তারা তাদের মা, অর্থাৎ ঐ বিধাতার মেয়ের পূজাও করে। বলে—মা গো! এস, তোমাকে সাজিয়ে দিই এস।

তারা সাজায়,—ফুল দিয়ে সাজায়, পাতা দিয়ে, লতা ফসল ঘাস দিয়ে সাজায়, ফুল দিয়ে গড়ে গয়না, ফুলের পাশে দেয় পাতার বাহার, লতা দিয়ে গাঁথে মালা, ধানের সবুজ পাতা দিয়ে দুর্ব্বা ঘাসের সুতা দিয়ে কাপড় বুনে দেয় তাঁকে পরিয়ে। কেউ মন্দিরের চূড়া গেঁথে তাবই মুকুট দেয় মাথায়, কেউ মুকুট গড়ে গম্বুজের, কেউ গড়ে অন্য ধরণের। কেউ গয়না গড়ে, সে গয়নাব তবকে তবকে শহর গড়ে, গ্রাম গড়ে, হরেক রকম নক্সা কাটে।

বলে—বল, কেমন হয়েছে?

বিধাতাব মেয়ে হাসেন, বলেন—তোরা দেখি আমার বাবার মত কারিগর।

ছেলেরা আশ্চর্য্য হয়ে গেল—তোমার বাবা? কে সে?

মা দেখিয়ে দিলেন আকাশ। বললেন—ওই আকাশের দিকে চেয়ে দেখ। কত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ঝকমক করছে, ঝলমল করছে, এসবই তিনি তৈরী করছেন।

—কোথায় থাকেন তিনি?

বিধাতার মেয়ের মুখ মলিন হয়ে গেল। বললেন—বাবা,

সে এক অপরূপ পুরী। সেই পুরী থেকে বাবা আমায় এখানে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিয়ে গেছেন; সে পুরীর রূপ ঐশ্বর্য্য আমার চোখের সামনে ভাসছে, কিন্তু সেখানে যাবার পথ তো আমি জানি না।

বলতে বলতে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল দরদর করে জলের ধারা।

ছেলেরা বললে—কেঁদ না মা, আমরা খুঁজে বের করব সে পুরীর পথ। খুঁজে নিয়ে আসব তোমার বাপকে, সেই বিধাতাপুরুষকে।

বিধাতাপুরুষ সাধে কি আর বিধাতাপুরুষ। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা ঘটছে দেখতে পান, যেখানে যে যা বলছে শুনতে পান, যেখানে যে যা ভাবছে বুঝতে পারেন। তিনি সব দেখলেন, সব, শুনলেন, সব বুঝলেন; ভারী কৌতুক হল তাঁর। তিনি আবার সবখানেই আছেন; আকাশে, বাতাসে, আলোতে, জলে, পৃথিবীর মাটিতে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, নক্ষত্রে সবখানেই আছেন। পৃথিবীর দেবতা তাঁরই মেয়েতে আর তাঁর ছেলে এই মানুষেরা যখন কথা বলছিল তখন তিনি আকাশে, বাতাসে, আলোতে তাদের আশেপাশেই ছিলেন। তিনি মনে মনে হেসে বলে উঠলেন —তোমরা আমাকে দেখতে চাও না-কি হে?

চমকে উঠল মানুষেরা। বিধাতার মেয়ে বললেন—ওই তো আমার বাবার গলার আওয়াজ।

মানুষেরা চেঁচিয়ে বলে উঠল—কোথায় তুমি?

হেসে বিধাতা বললেন—আমার পুরীর পথ দেখতে চাও তোমরা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—আমি দেখাও দিতে পারি, আমার পুরীর পথও তোমরা পেতে পার, সে কেবল এক সর্ত্তে।

—কি সর্ত্ত বল?

—তোমাদের মধ্যে যে আমাকে জয় করতে পারবে তাকেই আমি দেখা দেবো। সে-ই দেখতে পাবে আমার পুরীর পথ।

—কি করে জয় করব বল?

—সে তোমরা জান। আমি কি জানি? তোমরা দেখি আমাকে জয় করতে চাও, সুতরাং তোমাদের শক্তি আমার চেয়েও বেশী। কেমন ঠিক নয় কি?

—হ্যাঁ। তা বটে। তোমার চেয়ে জোর না থাকলে কেমন করে তোমাকে জয় করব! ঠিক কথা।

—তা হলে এখন বুঝে দেখ, তোমাদের মধ্যে যে সবাইকে জয় করতে পারবে তারই জোর আমার চেয়ে—তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী।

—হ্যাঁ, তাও বটে!

—আমি তখন তারই কাছে হার মেনে নিজে দেখা দেব, ধরা দেব, নিজের পুরীর পথ ছেড়ে দেব। কেমন, ভাল কথা বলিনি আমি?

—নিশ্চয়! নিশ্চয় এ ভাল কথা! এতে আর হাঙ্গামা

কোথায়? এ আমরা ঠিক করে নিচ্ছি। তুমি দাঁড়াও একটুখানি।

হা হা করে হেসে উঠলেন বিধাতা। বললেন—একটুখানি সময় কেন? অনন্তকাল আমি রইলাম তোমাদের আশে-পাশে, মাথার উপরে পায়ের তলার মাটিতে। জয় করো, তোমরা নিজেদের নিজেরা জয় করো।

বাস্। মানুষের মধ্যে পড়ে গেল সাজ-সাজ রব। এ বলে, আমাকে মেনে নাও তোমরা, আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করো।

—কেন, তা করবো কেন?

—যদি তা না করো আমি তোমাদের গায়ের জোরে স্বীকার করাবো।

একজন বললে—গায়ের জোরই সব নয়। আমার বুদ্ধি তোমার চেয়ে বেশী। আমার বুদ্ধির কাছে তোমার গায়ের জোরকে হার মানতে হবে।

জনকয়েক এগিয়ে এসে বললে—আমাদের এক একজনের গায়ের জোর ওর চেয়ে বেশী নয়, এক একজনের বুদ্ধি ওর চেয়ে কম এ কথাও ঠিক। কিন্তু আমাদের সব ক'জনের মিলিয়ে যে গায়ের জোর এবং বুদ্ধি তা' তোমাদের দুজনের চেয়ে অনেক বেশি।

আরম্ভ হয়ে গেল মারামারি কাটাকাটি। সে এক ভীষণ কাণ্ড। পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল মানুষ,

ক্ষোভে যন্ত্রণায় অপমানে এ ওকে আঘাত, ও একে আঘাত করে—রক্তে রক্তে লাল হয়ে যেতে লাগল মাটি। মানুষ মরতে লাগল, মৃতদেহের লোভে আশেপাশে শেয়ালেরা চীৎকার করতে লাগল, মাথার উপরে পাক দিয়ে উড়তে লাগল কাক, চিল, শকুনি মাংসাশী পাখীর দল।

আশপাশ থেকে হাসতে লাগলেন বিধাতা।

হঠাৎ একজন চীৎকার ক'রে বলে উঠল—থামো হে বিধাতা থামো। হেসো না অমন করে।

—কেন হে? আরও জোরে বিধাতা পুরুষ হেসে উঠলেন।

—কেন? আমি জয় করেছি সকলকে। তাকিয়ে দেখ।

দেখা গেল, মহাশক্তিমান মানুষটি রক্তরাঙা তলোয়ার হাতে নিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর সমস্ত মানুষের দলের অনেক গিয়েছে ম'রে, যারা বেঁচে আছে তারা নতজানু হয়ে বসে আছে।

বিধাতা পুরুষের গলা শোনা গেল—দেখেছি। কিন্তু ও তো হয়নি। কেউ তো পরাজয় স্বীকার করেনি। জিজ্ঞাসা কর ওদের।

শক্তিমান লোকটি চমকে উঠল। —কে বললে? কি, তোমরা পরাজয় স্বীকার করছ না?

নতজানু নতশির মানুষেরা নতজানু হয়েই রইল, মুখে কোন কথা বললে না, কিন্তু আকাশে বাতাসে ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত আওয়াজ উঠল—না-না-না।

শক্তিমান লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে বললে—কে বলছে এ কথা?

মানুষেরা উত্তর দিতে পারলে না, উত্তর দিলেন বিধাতা-পুরুষ—ওদের মন বলছে, ওরা বলছে, ওরা বলছে 'না'।

শক্তিমান লোকটি তখন বললে—ভাল, অপেক্ষা কর, ওদের মনকে আমি চুপ করিয়ে দিচ্ছি।

বিধাতাপুরুষ কথা বললেন না। হাসতে লাগলেন।

শক্তিমান লোকটি মানুষের দিকে ফিরে, চোখ লাল করে রাগে গর্জ্জন করতে লাগলেন; তলোয়ার তুলে ধরে বললেন—মনকে তোমাদের চুপ করাও। চুপ করাও। চুপ করাও।

নির্বাক লোকগুলি থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। চোখে তাদের ভয় ফুটে উঠল। কিন্তু আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি বাজতে লাগল—না-না-না।

সে যেন কিছুতেই থামবে না।

শক্তিমান ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আর ক্ষমা করব না। এবার কঠোর শাস্তি দেব।

লোকেরা সভয়ে বললে—প্রভু, আমাদের দোষ কি? আমরা তো 'না' বলছি না।

—বলছ না, তবে কে বলছে?

—আমাদের মন বলছে, কিন্তু বোধহয় বলাচ্ছেন বিধাতা-পুরুষ।

শক্তিমান বললেন—তা হলে এ বিধাতাপুরুষের ষড়যন্ত্র। ডাকি তা হলে তাকে। তোমরা বল এ কথা তাঁকে।

হঠাৎ একজন উঠে দাঁড়াল। বললে—না।

—কি, না?

—বিধাতাপুরুষের ষড়যন্ত্র নয়। অন্যের কথা জানি না, আমার নিজের কথা বলছি, আমার মন সত্যিই বলছে 'না'। আমার মন যখন বলছে তখন আমিই বলছি নিশ্চয়।

—সাবধান! গর্জ্জে উঠলেন শক্তিমান। আকাশে যেন বাজ ডেকে উঠল।

—ভয়ে তো মিথ্যা বলতে পারব না। আমার মন যখন 'না' বলছে, তখন আমিই বলছি—না-না-না।

আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠল—না-না-না।

সে শব্দ শুনে মানুষেরা অভয় পেলে, বল পেলে, ভোরের পাখীর ডাক শুনে যেমন অন্ধকারে ভয় পাওয়া মানুষ অভয় পায়। যে লোকটি বলছিল কথা তার মুখের দিকে তাকিয়ে তারা অসীম আশ্বাস পেলে, চোখে ফুটে উঠেছিল যে আতঙ্ক সে আতঙ্ক মিলিয়ে গেল। ভোরের সূর্য্যের আলো যেন তার মুখের চারিদিকে ফুটে উঠেছে।

সে বললে—ভয় নাই, তোমাদের ভয় নাই। আমার অন্তর বলছে—না। আমি বলছি—না। তোমরাও বুঝে দেখ, তোমাদের অন্তর যদি বলে—না, তবে তোমরাও মুখে বল—না। শাসনকে ভয় ক'রো না, মৃত্যুকে ভয় ক'রো না।

শক্তিমান তখন রাগে অধীর হয়ে তার একজন অনুচরকে বললে—বাঁধ ওকে।

শক্তিমানের প্রসাদের লোভে তখন কতকগুলি লোক তার অনুচর হয়ে ছিল। তারা তাকে বাঁধলে। হাতে পায়ে গলায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সামনে ফেললে তাকে।

শক্তিমান বললে—এইবার বল।

সে বললে—আমার মন এখনও বলছে--না, আমিও বলছি 'না'।

তখন আদেশ হল—মারো চাবুক।

শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক, ভীষণ এক বলশালী অনুচর নিয়ে দাঁড়াল।

—এইবার বল।

আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠল—না-না-না।

—লাগাও চাবুক।

চাবুক চলতে লাগল সপাং—সপাং—সপাং। কেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল সমস্ত অঙ্গ। রক্ত ঝরতে লাগল। মানুষেরা নির্ব্বাক নিস্তব্ধ। সে শুধু চোখটি মুছে বলছে—না-না-না।

পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনি উঠতে লাগল—না-না-না।

হঠাৎ এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। যে অনুচরটি চাবুক মারছিল সে চাবুক ফেলে দিলে। ফেলে দিয়ে আহত লোকটির পাশে নতজানু হয়ে বললে—ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর।

শক্তিমান তখন নিষ্ঠুর ক্রোধে এগিয়ে এল তার উদ্যত অসি নিয়ে। আঘাত করলে তার হাতে পায়ে, বললে—বল এইবার।

—না।

আবার আঘাত করলে দেহে —বল।

—না।

মানুষেরা সবিস্ময়ে দেখছিল। দেখতে দেখতে তারা আর নতজানু হয়ে থাকতে পারলে না। উঠে দাঁড়াল। এসে ঘিরে দাঁড়াল শক্তিমানকে, আর সেই বিচিত্র মানুষকে। অপরূপ! একজন হঠাৎ বলে উঠল—অপরূপ! অপরূপ!

শক্তিমান বললে—কি? ভয় নেই তোমাদের?

সেই মানুষটি এবার গান গেয়ে উঠল।

'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'

—কে? কে তুমি?

—আমি কবি।

—কবি? কবি কি?

—তা কি আমি জানতাম আগে? আগে ছিলাম শুধু মানুষ। এখন, ভেতর থেকে একজন বলছে—আমি। আমি অপরূপের পূজারী। আজ থেকে আমি কবি।

—এ সব কি বলছ তুমি?

—ঐ অক্ষয়-জীবন মানুষের জয়গান করছি। জয়-জয়-জয়-জয়-জয়-জয়!

অকস্মাৎ সকল মানুষ ভয় ভুলে গেল, তারাও গেয়ে উঠল—জয় জয় জয়!

আকাশে বাতাসে এবার—না-না প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেল, তার বদলে প্রতিধ্বনি উঠল—জয়-জয়-জয়!

সে ধ্বনির এমনি প্রভাব যে শক্তিমানের হাত থেকে খসে পড়ে গেল তরবারী। সে সভয়ে হাতে মুখ বন্ধ করে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল।

অকস্মাৎ সমবেত লোকেরা দেখলে—এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ঐ আহত লোকটির বুকের উপর ভাসছে।

মুমূর্ষু লোকটির মুখ হাসিতে ভরে উঠল, বললে—পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি।

—কাকে? কাকে? কাকে গো?

—বিধাতাকে।

—কই? কই? কই!

জ্যোতির মধ্যে থেকে বাণী শোনা গেল—এই যে আমি।

—তুমি বড় নিষ্ঠুর। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?

—ছিলাম তো তোমাদের অন্তরের মধ্যেই। আমিই তো তোমাদের ভিতর থেকে বলছিলাম—না-না-না। তোমরা আমার সঙ্গে সুর মেলালে না—আমাকে পর করে রাখলে। আর এই মানুষটি আমার সুরে সুর মিলিয়ে আমার সঙ্গে এক হয়ে গেল। তাই তো তার কাছে মানলাম হার; তোমাদের অন্তরের মধ্যে থেকে গেয়ে উঠলাম, জয়-জয়-জয়, ওর কাছে দিলাম ধরা। ওকে এলাম নিতে আমার পুরীর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

আহত লোকটি বড় সুন্দর হাসি হেসে বললে,—তার আগে—।

—কি তার আগে?

—আমাদের মা, তোমার মেয়েকে দেখা দাও, আমার এই বুকের রক্তে একটি আঙুল তোমার চুবিয়ে নাও। মাকে আমি কোন ভূষণ দিতে পারিনি। এরই টিপ আমার মায়ের কপালে পরিয়ে দিয়ে এসো।

বিধাতার মেয়ে পৃথিবীর কপালে সেই টিপ জ্বলজ্বল করছে, আজও—করবে চিরকাল।



কাক পণ্ডিত

কালো লম্বা মানুষটি—ঘোর কালো। গলায় পৈতা আছে বলিয়া বোঝা যায় ব্রাহ্মণ। নাম, যতীন চাটুজ্জে। পাঠশালার পণ্ডিত। লোকে বলে, কাক-পণ্ডিত।

শুধু কালো বলিয়াই নয়। আরও কথা আছে ইহার মধ্যে। ছোট্ট একখানি চাষীব গ্রামেব পাঠশালা। ওই যতীনই আসিয়া স্থাপন করিয়াছে। মূল জীবিকা ব্রাহ্মণহীন চাষীর গ্রামে গ্রাম-দেবতার পূজা করা, ঘরে ঘরে ষষ্ঠী পূজা, লক্ষ্মীপূজা করা, মাঠে আখমাড়াইয়ের সময় শালপূজা করা। যতীনকে এইজন্য লোকে প্রকাশ্যে বলে,—যতীন ঠাকুর।

বুদ্ধিমান যতীন অতঃপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া পাঠশালা খুলিয়া বসিল। জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা বসে। কয়েক বৎসরই পাঠশালা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও পাঠশালার

একটি ছাত্রও বৃত্তি পায় নাই। সেটা যতীনের অক্ষমতা নয়। সে ভাল ছেলে তৈয়ারি করিলেই পাশের গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিতেরা জামা-কাপড়, বই-টাকার লোভ দেখাইয়া ছেলেটিকে ভাঙাইয়া লইয়া যায়। এমন কয়েকটি ছেলেই অন্য পাঠশালা হইতে বৃত্তি পাইয়াছে। তাই তার কালো চেহারার সঙ্গে মানাইয়া লোকে গোপনে তাহাকে বলে,—কাক-পণ্ডিত। অর্থাৎ কাকের মতই সে কোকিলের ছানা মানুষ করে, একদা সে ছানা বড় হইয়া অন্যত্র গিয়া কুহু—কুহু করিয়া গান গাহিয়া চারিদিক মাতাইয়া দেয়। লোকে তারিফ করে।

পূজা এবং পড়ানো একই সঙ্গে চলে যতীন চাটুজ্জের। সকালে পূজা না হইলে দেবসেবায় ত্রুটি হয়, আবার পাঠশালা —সেও সকালে না বসাইলে নয়। যতীন অতি সুকৌশলে, দুই কাজ সারিয়া যায়। পাঠশালা বসাইয়া সে অপেক্ষা করিয়া থাকে।

“পাখী সব করে রব”-এর পরেই বসে তাহার পাঠশালা, এবং যেই দেখে “শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে”,—অমনি যতীন তেলের বাটি লইয়া বসে। পাঠশালাতে বসিয়া তেল মাখাও চলে, আর ছেলে-পড়ানোও চলে। তারপর বলে—গ্রহণ কর, সব শেলেট গ্রহণ কর এইবাব।

যতীন সাধু-ভাষায় কথা বলে।

ছেলেরা ‘শেলেট’ গ্রহণ করিলে বলে—আপন আপন পাঠ-গুলি যত্নসহকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক’রে লিখে রাখ। আমি

অবগাহন ক'রে আসি। আচ্ছা, ভোলা, অবগাহন শব্দের অর্থ কি, বল্ তো?

আজ্ঞে, এমনি ক'রে ডুব দেওয়া।

ভোলা কান দুইটি আঙুল দিয়া বন্ধ করিয়া বায়ু-সরোবরেই ডুব দেয়।

যতীন ধাঁ করিয়া স্নান সারিয়া আসে। জমিদারের কাছারিতেই পাঠশালা বসে, কাছারির প্রাঙ্গণে কয়েকটি জবা, আকন্দ ও কল্কে-ফুলের গাছ, গোটা-দুই বেলের গাছও আছে। কাপড় ছাড়িয়া যতীন কয়েকটা ফুল তুলিয়া লয়, অতঃপর বিল্বপত্র চয়ন করিবার পূর্ব্বে কপালে হাত ঠেকাইয়া অদৃশ্য বৃক্ষবিহারীকে প্রণাম করিয়া তবে বিল্বপত্র চয়ন করে।

তারপরই হয় টিফিনের ছুটি।

সে বিল্ববাসিনীর ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই ভাঙা কাঁসরটা ঢন্-ঢন্ শব্দে বাজাইয়া দেয়। ছেলেরাও অমনি ছুটি পাইয়া কলরব করিতে করিতে বাড়ী ছুটে।

যতীন পণ্ডিতের উপদেশ দেওয়া আছে, গুড়সহযোগে মুড়ি অথবা যার পিতামাতা যা দেবেন, সন্তুষ্টচিত্তে প্রসন্নমনে তাই ভক্ষণ করবে। তারপর পিতার গাভী দোহনের সময় গো-বৎসটিকে ধৃত ক'রে পিতাকে সাহায্য করবে। গাভী দোহনের পর আবার পাঠশালায় আগমন করবে। বুঝেছ?

ছাত্রদের পিতার গাভী দোহন হইতে হইতে পণ্ডিতের পূজা শেষ হইয়া যায়। শুধু ঐ পূজাই শেষ হয় না, যতীনের উদরপূজাও শেষ হইয়া যায়। কাছারির বারান্দায় ছেঁড়া

মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সে ছাত্রদের জন্য অপেক্ষা করে।

মণি মণ্ডলের ভগ্নী 'ফুরি' বিল্ববাসিনীর পূজার প্রদীপ ও ধূপ দেয়। এটি জমিদারের বন্দোবস্ত, মণি মণ্ডল ইহার জন্য জমি ভোগ করে। ফুরি বলে ঠাকুর 'আস্তা' থেকে মন্তর বলতে বলতে আসে। পাঠাশালার কাঁসর শুনেই আমি প্রদীপ সাজিয়ে ধূপের আগুন নিয়ে আসতে আসতে দেখি, ঠাকুরের পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে।

ফুরি একদিন যতীনকে এ কথা বলিয়াছিল।

যতীন গম্ভীরভাবে তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—ঈদৃশবাক্য আর কখনও তুমি উচ্চারণ ক'রো না, বুঝেছ?

ফুরি হাসিয়া সারা হইয়াছিল,—'ঈদৃশ বাক্য' কি গো? ঈদৃশ বাক্য! হি-হি-হি! ঈদৃশ বাক্য কথাটি তাহার বড়ই কৌতুককর মনে হইল। ফুরি আড়ালে যতীনের নাম দিয়াছে—'ঈদৃশ বাক্য'।

যাক সে কথা।

টিফিনের পর যতীন পাঠশালা লইয়া বসে, একেবারে পূরা তিনটি ঘণ্টা পড়াইয়া ছেলেদের ছাড়িয়া দেয়। পাঠশালার বড় ছেলেরা এই সময়টার নাম দিয়াছে, 'কালবোশেখী'। বলে—'কালবোশেখীর ঝড় আসছে'। যতীন নিজেও সে সময় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে। আপশোস করিয়া বলে—খদ্যোত কখনও গগনগাত্রে আরোহণ করতে পারে না। বৃথা চেষ্টা আমার।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে,—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙেরে হীরার ধার।

বলিয়াই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গবেষণায় নিযুক্ত হয়, ঐ 'ভেড়া' শব্দটি অত্যন্ত দুষ্টপ্রয়োগ হইয়াছে। মেষ বলিলে ক্ষতি কি ছিল? গুরু-চণ্ডালী দোষ অমার্জ্জনীয়। তারপর হইতে সে ভেড়ার শৃঙ্গে না বলিয়া, মেষের শৃঙ্গেই বলে।

সেদিন বিল্ববাসিনীর পূজা শেষ করিয়া মুড়ি এবং গুড় ভোজনান্তে হুঁকাটি হাতে পাঠশালাতে আসিয়া যতীন দেখিল, জমিদারের গমস্তা ও নগ্দী বসিয়া আছে।

সে তাড়াতাড়ি গমস্তাকে আহ্বান করিয়া বলিল—আসুন, আসুন, আসুন। আপনাদের সব মঙ্গল? শুভ সংবাদ ত' সব?

যেন কাছারিটি তাহারই নিজের বাড়ী।

গমস্তা বলিল—হ্যাঁ, সব মঙ্গল। তারপর, আপনার যে কাজ এসেছে, সেইজন্যেই এসেছি।

কল্কেটি গমস্তার নিকট নামাইয়া দিয়া বলিল—কি কর্ম্ম, ব্যক্ত করুন।

পোঁটলা হইতে ছোট হুঁকাটি বাহির করিতে করিতে গমস্তা বলিল—বাবু আসছেন মহালে।

যতীন বলিল—অহো ভাগ্য! সুসংবাদ, সুপ্রভাত হয়েছে অদ্য। গ্রামের সৌভাগ্যের বিষয়। জমিদার, ভূস্বামী, রাজা—

গমস্তা বাধা দিল, নতুবা জমিদারের আরও অনেক নাম সে বলিতে পারিত। গমস্তা বাধা দিয়া বলিল—বিল্ববাসিনীর পূজো যখন নেন, তখনকার কথা মনে আছে ত'—বাবু এলে পাক-শাক এখানে আপনাকেই করতে হবে। অবশ্য বাবু নিশ্চয় বক্‌শিস দেবেন।

যতীন বলিল—অবশ্য অবশ্য। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য করণীয়, অবশ্যই আমি চালিত ক'রে দেব।

এইটুকুর একটু ইতিহাস আছে। যতীন এ-গ্রামের বাসিন্দা নয়। এ-গ্রামে পূর্ব্বে একঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারাই বিল্ববাসিনীর পূজা করিত এবং তাহার জন্য জমিদার-প্রদত্ত জমি ভোগ করিত। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে সে ব্রাহ্মণ-বংশটি নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। যতীন এ-গ্রামে পাঠশালা করিত, সে এই পূজারকত্ব-পদের প্রার্থী হইল। তখনই কথা হয়, তাহাকে এই গ্রামে বাস করিতে হইবে, গ্রামের সকলের পৌরোহিত্যও করিতে হইবে এবং জমিদার অথবা তাঁহার কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধি আসিলে তখন পাচকের কাজও করিতে হইবে।

যতীন তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ গ্রহণ করিয়াছে। বিনিময়ে জমিদার-প্রদত্ত নিষ্কর আট বিঘা জমি সে পাইয়াছে। কাজ লইয়া পাঠশালা করিতে প্রায়ই বড় অসুবিধা হয়। গ্রামে কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম থাকিলে সেদিন আর পাঠশালা করা হয় না, অথবা পাঠশালা সারিয়া সে কর্ম্ম সারিতে গেলে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয়।

এবং গৃহস্থের তিরস্কার সহ্য করিতে হয় বিস্তর। কিন্তু তবু যতীন পাঠশালাটি ছাড়ে নাই। নানা কৌশলে সুবিধা-অসুবিধার একটা সমন্বয় সে করিয়া ফেলিয়াছে।

গমস্তা বলিল—হ্যাঁ, সেই জন্যই বাবু রাঁধুনী-বামুন সঙ্গে আনবেন না। যতীন একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল—দেখুন, একটি অসুবিধা হবে ব'লে অনুমান করছি। হুজুর হলেন, শহর-নিবাসী, দশ ঘটিকার সময় আহার করা অভ্যাস। কিন্তু আবার বিবেচনা করুন, বিশ্ববাসিনীর পূজার্চ্চনা, তৎপর পাঠশালার কর্ম্ম—

ধমক দিয়া গমস্তা বলিল—পাঠশালা এখন বন্ধ ক'রে দেন। আর বাবু এলে পাঠশালা করবেনই বা কোথায়? কাছারিতে ত' এখন পাঠশালা করা যাবে না।

যতীন বলিল—কিন্তু, মায়ের পূজা ত'—

গমস্তা বলিল—সে ত' ন-টার মধ্যেই হয়ে যাবে। ন-টায় রান্না চড়ালে বারটায় শেষ হবে। বাবু আমাদের বারটার এদিকে খান না।

যতীন খুশী হইয়া বলিল—অবশ্য অবশ্য; দ্বাদশ ঘটিকা হ'ল ঠিক মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন-ভোজন মধ্যাহ্নেই কর্ত্তব্য। হুজুর আমাদের মহদ্বংশোদ্ভূত মহৎ ব্যক্তি।

—হ্যাঁ, কাল হ'তে পাঠশালা আপনি ছুটি দিয়ে দেন কাছারিতে কলি ফেরাতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। তারপর নগদীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—কাঠ কেটে চেলা ক'রে রাখ। একটা বড় দেখে ডাল কারও গাছের কেটে নে।

যতীন বলিল—হঁ্যা বৎস। শাখাটি যেন বেশ শুষ্ক হয়। ভিজা কাষ্ঠ হ'লে ধূম্রে ধূম্রে অন্ধ হয়ে যেতে হবে। তিন্তিড়ী-শাখা হলেই উত্তম হবে। এরূপ দাহ্য-কাষ্ঠ আর হয় না।

নন্দী বলিল—কার গাছের ডাল নোব?

বিরক্ত হইয়া গমস্তা বলিল—যার পাবি তারই নিবি। তাই তেঁতুল-ডালই একটা যার গাছ থেকে হোক কেটে নে।

যতীন যোড় হাত করিয়া বলিল—এইসঙ্গে কয়েকটি বংশখণ্ড ছেদনের আদেশও ওকে দিতে হবে।

গমস্তা বলিল—আপনার মশাই কোন্ সময়ে কোন্ তান। কেন, বংশখণ্ড নিয়ে কি করবেন? ঘর ত' আপনার ছাওয়ানো হ'য়ে গিয়েছে।

যতীন বলিল—আজ্ঞে, তোরণ নির্ম্মাণ করব; হুজুব যেদিন পদার্পণ করবেন, সেদিন পত্রপুষ্প দিয়ে সুসজ্জিত করব।

গমস্তা বলিল—তাই দিস রে, গোটা-আষ্টেক বাঁশ কেটে ঠাকুরকে দিস।

ছাত্ররা তখন সব আসিয়া গিয়াছে, তাহারা শুনিতে শুনিতে খুশি হইয়া উঠিল,—ছুটি—ছুটি। 'কালবোশেখী' হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

যতীন এইবার ছেঁড়া মোড়াটিতে বসিয়া আরম্ভ করিল—ছকু, তুমি ভূস্বামী বানান করতো।

ছকু নির্ভুল উত্তর দিল।

—হরিচরণ ভূস্বামী শব্দের অর্থ কি?

হরিচরণ বলিতে পারিল না। হরিচরণের পর একে একে সকল ছাত্রকেই প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারিল না। তখন যতীন বলিল—মরিরাম, তুমি এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পার ?

শীর্ণকায় টল্‌টলে মুখে মরিরাম গলায় এক বোঝা মাদুলি লইয়া উঠিয়া বলিল—আজ্ঞে, ভূস্বামী মানে—রাজা, জমিদার।

যতীন খুশি হইয়া বলিল—আমার নিকটে আগমন কর।

মরিরাম তাহার নিকটে আসিল, যতীন তাহার শীর্ণ দেহে হাত বুলাইয়া বলিল—উত্তম, যথার্থ উত্তর প্রদান করেছ। তারপর সে ছেলেদের—জমিদার কে এবং কি, বুঝাইতে আরম্ভ করিল। ছেলেরা কালবোশেখীর হাত এড়াইয়া জমিদারের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছিল। বক্তৃতা-শেষে যতীন বলিল—আগামী কল্য হতে বিল্ববাসিনী মায়ের প্রাঙ্গণে ঐ বৃক্ষচ্ছায়াতে পাঠশালা চালিত হবে, এবং প্রাতঃকালের পরিবর্ত্তে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হতে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত হবে।

ছেলেরা পাংশুমুখে এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীন আবার বলিল—হৃদয়ঙ্গম হয়েছে সব ?

সকলে ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, হইয়াছে। মরিরাম ছেলেটি মৃদুস্বরে বলিল—আমাকে তা হ'লে কখন পড়াবেন ?

মরিরামকে যতীন পৃথকভাবেও পড়াইয়া থাকে, সে সময়টা ঐ দুই ঘটিকা হইতে চার ঘটিকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে।

যতীন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, তুমি বৎস, অতি প্রত্যূষে আমার গৃহে আগমন করবে। ছয় ঘটিকা হতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত তোমার পাঠাভ্যাস করিয়ে দোব।

ছেলেটিও খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

জমিদারবাবুটি এ-যুগের মানুষ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি। তবুও তোরণ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনিও ঈষৎ পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। আবার কাছারিতে গিয়া একখানি টিনের চেয়ারে বসিতেই কতকগুলি ছেলে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপব সকলে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া কাছারির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিয়া সুর কবিয়া আরম্ভ করিল—

বাবংবার প্রণিপাত চরণে তোমার।
হে মহতোমহীয়ান করুণা অপাব॥
প্রজার পালনে তুমি রামের সমান।
বিদ্যার সাগর তুমি জ্ঞানী গুণবান॥

এবার জমিদারবাবুটি হাসিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ। কে শেখাল এসব তোমাদের?

যতীন আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আজ্ঞে, অধম হুজুরের আশ্রিত ব্যক্তি। বিশাল মহীরুহে কত পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করে; বৃক্ষ সকলকে জ্ঞাত হয় না। অধীনও তদনুরূপ একটি কীট-প্রতঙ্গ।

গমস্তা মুচকি হাসিয়া বলিল—উনি হলেন, যতীন ঠাকুর, বিল্ববাসিনী মায়ের পূজা করেন আর পাঠশালায় পণ্ডিতী করেন।

জমিদারবাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ, আপনি তা হ'লে পণ্ডিতমশায়। বাঃ, আপনার কথাগুলি বড় চমৎকার। সুন্দর শুদ্ধ। বাঃ, বেশ।

'পণ্ডিত' সম্বোধনে এবং এমন অজস্র প্রশংসাবাদে যতীন যাহাকে বলে পরম পুলকিত, তাই হইয়া উঠিল; পুলকের আতিশয্যে তাহার চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। সে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর মহৎ, অধীন ক্ষুদ্র। কিন্তু হুজুর, বিবেচনা করে' দেখুন, আমি ব্রাহ্মণ শিক্ষকতা আমার কর্ম্ম। হুজুর, আমি যদি অশুদ্ধ ভাষায় কথোপকথন করি, কিংবা ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ প্রয়োগ করি, তবে আমার ছাত্রেরা কিরূপে শুদ্ধ এবং সাধুভাষায় জ্ঞান লাভ করবে? যদি কেউ স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্ত্তে অহরহ পিত্তলের অলঙ্কারই ব্যবহার করে, তবে পিত্তলকেই সে স্বর্ণ ব'লে জ্ঞান করে।

গমস্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—যান গো এইবার যান, রান্না চড়িয়ে দেন গিয়ে।

যতীন বলিল—হ্যাঁ, এই যে আমি প্রস্তুত। অবিলম্বেই রন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। কোনও চিন্তা নাই।

জমিদার বলিলেন—আপনিই রান্না করবেন নাকি?

—হ্যাঁ, হুজুর। হুজুরের আশ্রিত আমি, তদুপরি মহাভাগ্য আমার, নতুবা আমার হস্তের রন্ধনে হুজুরের সেবা হবে

কেন? বলিয়া সে একখানি দরখাস্ত হুজুরের হাতে দিল। দরখাস্তখানি পড়িবার পূর্ব্বেই লেখানির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াই জমিদার মুগ্ধ হইয়া গেলেন। হাতের লেখাটি অতি সুন্দর, প্রথম দৃষ্টিতে ছাপা-লেখা বলিয়াই ভ্রম হয়। সপ্রশংস দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—আপনার লেখা? বাঃ এ অতি সুন্দর লেখা, এত সুন্দর লেখা আমি কখনও দেখি নি।

যতীন আবার আরম্ভ করিল—হুজুব, হস্তলিপি সুন্দর না হ'লে শিক্ষকতা করা চলে না। কারণ ছাত্রগণ গুরুর হস্তলিপিকেই আদর্শ জ্ঞান ক'রে সেইরূপ শিখবারই চেষ্টা করে। তদ্ব্যতীত, চিন্তা ক'বে দেখুন হুজুর, অগ্রে লেখা, তৎপরে পড়া। সেই জন্যেই লেখাপড়া শব্দ প্রচলিত হয়েছে।

দরখাস্তখানি হুজুব পড়িতেছিলেন, প্রথমেই যতীন আরম্ভ করিয়াছে—"মহামহিম মহিমার্ণব জ্ঞান-গুণ প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণ সমলঙ্কৃত প্রজাপালক ভূস্বামীপ্রবব শ্রীল শ্রীযুক্ত ·… মহোদয় অশেষ প্রবলপ্রতাপেষু।" তাহার পব দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া গ্রামের পাঠশালাটিব দুববস্থা বর্ণনা করিয়া হুজুরের করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

জমিদার প্রশ্ন করিলেন—সরকারী সাহায্য কত ক'রে পান?

—এক কপর্দ্দকও নয় হুজুর।

—কেন?

—আমি যে 'জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী' পাস নই হুজুর।

জমিদার বিস্মিত হইলেন। যতীন সবিনয়ে বলিল—ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন অধীনের, রহস্য ক'রে ও-বাক্যটি আমি প্রয়োগ করেছি। গুরুট্রেনিংকে বলা হয়, জি ও টি। রহস্য ক'রে আমরা বলি—জেঠি, জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী।

জমিদার হাসিয়া বলিলেন—বুঝেছি। আচ্ছা, আমি বরং সেজন্যে চেষ্টা করব।

যতীন বলিল—হুজুর, আক্ষেপের বিষয় আর কত নিবেদন করব! আমার পাঠশালার ছাত্রকে বৃত্তি-পরীক্ষা দিতেও অনুমতি দেওয়া হয় না। আমার শিক্ষকতার কৃতিত্ব দেখাতে পেলাম না। নতুবা আমি অহঙ্কারসহকারে বলতে পারি, আমার ছাত্র প্রত্যেকবারই বৃত্তি-পরীক্ষাতে কৃতকার্য্য হ'ত; এবং সেইজন্যই আমি যাদের শিক্ষিত ক'রে তুলি, তাদেরই গ্রহণ ক'রে অবশেষে লোকপাড়ার বিদ্যালয় বৃত্তি-পরীক্ষায় সুনাম অর্জ্জন করে। বর্ত্তমান বৎসরে মরিরাম নামক একটি বালক আছে হুজুর, তাকে হীরকখণ্ড বলা যায়, যদি কোনরূপে অনুমতি পাই হুজুর—

নগদীটা উনানে আগুন দিয়াছিল, সে বাধা দিয়া ডাকিল—কাঠগুলো পুড়ে যে "ছুদ্ধর" হয়ে গেল মশায়।

যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিল—এই যে আমিও আগমন করছি। তুমি হরিদ্রা লঙ্কা আদ্রক প্রভৃতি মসলাগুলি বণ্টনের ব্যবস্থা কর দেখি।

রান্নাঘরের দাওয়া হইতে, গমস্তা বলিল—বণ্টনের ব্যবস্থা

হয়েছে, এখন আপনি আগমন করুন দেখি। হুজুর তো এখন রইলেন, পরে ওসবের ব্যবস্থা হবে।

যতীন রান্নাশালে আসিতেই নগ্দীটা বলিল—তুমি কিন্তুক্ আচ্ছা বকতে পার মশায়। ব'কে-ব'কে মানুষের কানের পোকা মেরে ফেলাও। আঃ, সেই কাল থেকে লেগেছে বাপু!

যতীন চোখ মুছিয়া বলিল—তুমি কি বুঝবে বৎস। কথিত আছে, 'মহতের ধর্ম্ম মহতে জানে, মহতের টান মহতে টানে।' তোমার অবশ্য অপরাধ কি?

জমিদারটিকে যতীনের বড় ভাল লাগিয়াছে। গমস্তা, নগ্দী, বাবুর চাপরাসী—সকলেই যতীনকে শাসন করে, কিন্তু বাবুর ব্যবহার বড় মিষ্ট, কখনও কটু কথা বলেন না। গমস্তা, নগ্দী, চাপরাসী ব্যবহারে যতীন দুঃখিত নয়, সে মনে মনে তাহাদের করুণা করে, একান্ত নির্জ্জনে সে আপন মনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে,—অজ্ঞতার মত দুষ্টব্যাধি আর সংসারে নাই।

প্রত্যহ প্রভাতে সে একটি করিয়া সমস্যা আনিয়া জমিদারবাবুর নিকট উপস্থিত করে। করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলে—হুজুর, অভয় দিলে অধীন একটি নিবেদন পায়।

বাবুর হাসির মধ্যেই অভয় ফুটিয়া উঠে। যতীন বলে—একটি সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে হবে হুজুরকে। হুজুর, এই সংসারের মধ্যে একদা অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের মধ্যে বিবাদ

হয়েছিল। অদৃষ্ট বলে,—আমি শ্রেষ্ঠ, আমি বলবান ; পুরুষকার বলে,—ভুল, আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই বলবান। এইটুকুই অবগত হয়েছি, মীমাংসার সংবাদ আমি জানি না। মীমাংসা হুজুরকে ক'রে দিতে হবে।

বাবু শিক্ষিত ব্যক্তি, তিান বলিলেন—মীমাংসা এখনও হয়নি পণ্ডিতমশাই। বিবাদ এখনও চলছে, কাজেই মীমাংসার খবর কেমন ক'রে দেব আপনাকে।

বাবুর উত্তরে যতীনের চমক লাগিয়া যায়, সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ফিরিয়া আসিয়া কথাটি ভাবিতে বসে। কিন্তু ভাবিয়াও বুঝিতে পারেনা। তবুও কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। সে মনে মনে কথাগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া "খবর" শব্দটির পরিবর্ত্তে "সংবাদ" শব্দটি বসাইয়া শুদ্ধ করিয়াও লয়।

সেদিন আসিয়া প্রশ্ন করিল—হুজুর জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, অথবা ভক্তি শ্রেষ্ঠ ?

বাবু বলিলেন—ও-দু'টোর হ'ল আম আর আঁটির মত সম্বন্ধ পণ্ডিতমশাই। আম খেলেই যেমন আঁটি পাওয়া যায়, জ্ঞান এলেই তেমনি ভক্তি আসে। অবশ্য ভুয়ো আঁটিওয়ালা আমও আছে। সেটা ঐ আমের শাঁস শুকিয়ে যায় বলেই। সে আপনার অখাদ্য।

পণ্ডিতের তাক লাগিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। আকস্মাৎ রান্নাশালা হইতে গমস্তার তীব্র কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

গমস্তা তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল—বলি ব্যাপার কি আপনার বলুন ত ?

পণ্ডিত সভয়ে বলিল—কি আজ্ঞে ?

—এই পরশু দোকান থেকে সাতদিনের জিনিষপত্র আনিয়ে দিয়েছি। একসের ঘি এসেছে। এর মধ্যে আজ ঘি নাই, জিনিষপত্রও সব ফুরিয়ে গেল, ও-বেলায় আর চলবে না—এর মানে কি ?

যতীন হাতযোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে আমি বেশ অনুধাবন করতে অপারগ হচ্ছি কিরূপে অর্থ ব্যক্ত করব বলুন।

গমস্তা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—ওসব 'ব্যক্ত-মেক্ত' ছাড়ুন মশাই, নিয়ে সাদা কথায় বলুন।

ওদিকে কাছারী হইতে বাবু ডাকিলেন—রাধাচরণ!

গমস্তা কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তাড়াতাড়ি বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবু বলিলেন—বকাবকি কিসের হ'চ্ছে ? কি হ'ল ?

—আজ্ঞে, মহা বিপদ হয়েছে। জিনিষপত্র সব চুরি যাচ্ছে।

—চুরি যাচ্ছে ? কি চুরি গেল ?

—আজ্ঞে, পরশু দোকান থেকে হিসেব ক'রে সাতদিনের মত জিনিষপত্র আনিয়েছি। ঘি আনিয়েছি পাকী একসের। আজ আর জিনিষপত্র কিছুই নাই। ঘি ছটাকখানেক মাত্র পড়ে আছে। ও-বেলায় সব আসবে তবে রান্না চড়বে।

যতীনও পিছন পিছন আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে সম্মুখে আসিয়া বলিল—হুজুর, তস্কর যে কে, অনুসন্ধান

ক'রে দেখা হোক। আমি অদ্য হ'তে কাছারী ত্যাগের সময় বস্ত্র-অঙ্গ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়ে যাব হুজুর।

বাবু বলিলেন—না-না-না। যান আপনি, কাজ করুনগে যান।

ধমক দিয়ে গমস্তা বলিল—যান না মশাই, বাবু বললেন যেতে আর আপনি আবার আরম্ভ করলেন?

যতীন চলিয়া গেল।

গমস্তা বলিল—হয় ও, নয় ঐ নদ্দী বেটার কাজ।

বাবু বলিলেন—বেশত,' জিনিষপত্র একটু সাবধান ক'রে রেখে তুমিও একটু নজর রাখ, তা'হলেই আর চুরি যাবে না। আর ও নিয়ে কি কেলেঙ্কারী করে? ছিঃ!

গমস্তা আপন মনেই বক্ বক্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যতীন ম্লানমুখে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছে। কত গভীর চিন্তায় সে যেন মগ্ন। তিনি বুঝিলেন, কথাটা বেচারাকে বড়ই বাজিয়াছে। তাঁহারও মনটা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই বলিলেন—পণ্ডিত-মশাই, একদিন আপনার পাঠশালা দেখব আমি।

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সে সৌভাগ্য কি আর অধীনের অদৃষ্টে আছে?

বাবু বলিলেন—ওকথা কেন বলছেন? নিশ্চয় যাব আমি।

একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া যতীন বলিল—হুজুর সেদিন ব্যক্ত করলেন, অদৃষ্ট আর পুরুষাকারের দ্বন্দ্বের আজও অবসান হয়

নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, হয়েছে। অদৃষ্টই শ্রেষ্ঠ, সেই বলবান।

বাবু যতীনের এই আকস্মিক উক্তির হেতু বুঝিয়াছিলেন, তাই একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিলেন—না-না-না, কিছু মনে করবেন না আপনি। ওসব লোকের বিষয় ঘেঁটে-ঘেঁটে মনে ঘাঁটা পড়ে গেছে, সংসারে আর পাপ ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না ওদের। আমি আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি।

যতীনের চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িয়া গেল।

বাবুও আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। পাছে যতীনের উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইয়া উঠে সেই ভয়ে তিনি ঘরে আসিয়া বসিলেন। মিনিট-দশেক পরেই কিন্তু যতীন আসিয়া বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল—হুজুর।

—বলুন।

যতীন জোড়হাত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু দেখিলেন তাহার ঠোঁট ছুটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

তিনি গভীর সহৃদয়তার সহিত বলিলেন—কি বলছেন, বলুন।

যতীন ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা ছুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—হুজুর আমিই অপরাধী, আমিই তস্কর। ঘৃত মসল্লা আমিই অপহরণ করেছি হুজুর।

বাবু নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। যতীন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছিল। বাবু সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—আপনার বড় অভাব, নয়?

যতীন বলিল—হুজুরের আশীর্ব্বাদে অধীনের অভাব নাই হুজুর। তবে এই বালকটির জন্য। দরজার বাহির হইতে শীর্ণকায় মরিরামকে সম্মুখে আনিয়া বলিল—হুজুর, বড়ই মেধাবী ছাত্র এটি। কিন্তু সংসারে বড়ই অভাব। আমাকে কিছু-কিছু ক'রে সাহায্য করতে হয়। নতুবা উদরের দায়ে বালকটিকে পড়া পরিত্যাগ ক'রে কারও গো-চারণ চাকুরি গ্রহণ করতে হবে।

বাবুর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। যতীনের আবেগ তখনও নিঃশেষিত হয় নাই, সে বলিল—তাই হুজুর আপনার দরবার হ'তে কিছু মসল্লা একে প্রদান করেছি। আর ঘৃতটুকু হুজুর, ঐ ওকেই সেবন করতে দিয়েছি,—মেধাবী ছাত্র, ঘৃতে মেধা বৃদ্ধি হয়। হুজুর, ওকে এবার আমি বৃত্তি-পরীক্ষা যেমন ক'রে হোক দেওয়াবো। আমার ছাত্র নিয়ে লোকপাড়ার শিক্ষকেরা সুনাম অর্জন করে, আর আমায় বলে, 'কাক-পণ্ডিত'। হুজুর আমি শিক্ষিত করি, আর তারা অবশেষে তাকে গ্রহণ করে তাই···

আবার সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেটিও ইতিমধ্যে প্রণাম সারিয়া বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া করযোড়ে বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

বহুক্ষণ পরে বাবু বলিলেন—আচ্ছা পণ্ডিত আমি এখন থেকে পাঁচ টাকা করে সাহায্য করব। বুঝলেন?

যতীন করযোড় প্রশ্ন করিল—আমার পাঠশালা কবে পরিদর্শন করবেন হুজুর? আমি পত্রপুষ্প দিয়ে সমস্ত

সুসজ্জিত করব। হুজুর আপনি যে ভূস্বামী, রাজা, দেবতার অংশ—

যতীনের উচ্ছ্বাস থামিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু নন্দীটা চীৎকার করিয়া ডাকিল, এ্যাই-যা ডালটা পুড়ে গেল যে। ঠাকুরমশাই, ও ঠাকুরমশাই!

সত্যই পোড়া-গন্ধ উঠিয়াছিল, যতীন ত্রস্তপদে রান্নাশালার দিকে চলিয়া গেল।





আকাল হাড়ি আনন্দে পাগল হয়ে গেল। সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেল। ষাট বছর বয়স, কাঁচা পাকা চুল, বড় বড় চোখ, সাধারণ হাতের চার হাত লম্বা মানুষ কিন্তু শরীরে মাংস নাই। চামড়ায় ঢাকা মোটা পাঁজরাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়, মধ্যে মধ্যে দড়ির মত লম্বা মাংসপেশীর আভাষ বুঝা যায় শুধু। অল্প পরিশ্রমে হাঁপাতে হয় বেচারাকে, সেই লোক হঠাৎ সভার মধ্যে ঢুকে ঠিক সভাপতির টেবিলের সামনের খালি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—জয় মা কালী—জয় মা কালী—জয় জয় মা কালী।

সঙ্গে সঙ্গে সবল জোয়ানের মত লাফ দিয়ে শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে পর পর তিনটে 'মালক্ বাজী' দিলে; তারপর

বাংলাদেশের ডাকাতদের মত মুখে হাতের তালু খেলিয়ে শব্দ দিয়ে উঠল—আবা-বা-বা-বা-বা-বা-বা—। ইয়া!

সভাশুদ্ধ লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। সভার কাজের মধ্যে তার এই আকস্মিক আবির্ভাব এবং এই বিচিত্র আচরণ দেখে সকলে এমনি বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল যে তাকে থামাতে যেতেও কারও হাত পা নড়ল না। মনেও এ কথা উঠল না। যখন বিস্ময়ের ঘোর কেটে মন এবং শরীরের জড়তা কয়েক জনের কাটল, তখন আর লোকটিকে থামাবার প্রয়োজন ছিল না, সে নিজেই থেমে গিয়েছিল, মাটির উপর উপু হয়ে বসে হাঁপাচ্ছিল দুর্দ্দান্ত হাঁপনী রোগাক্রান্ত মর-মর মানুষের মত।

সভাপতি ব্যস্ত হয়ে লাফিয়ে নেমে এলেন সভাপতির আসন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক ছেলে।

আকালের কাঁধে হাত দিয়ে সভাপতি ডাকলেন—আকাল-আকাল!

সে উত্তর দিতে তো পারলেই না এমন কি মুখ তুলে তাকাতে চেষ্টা ক'রে তাও পারলে না, মাথাটা আপনিই ঝুলে পড়ল—সে হাঁপাতে লাগল। সভাতে স্থানীয় ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন তাঁকে ডাকলেন সভাপতি। ছেলেরা আকালকে ধরাধরি করে তুলে সভা থেকে বাইরে নিয়ে গেল। সভা আবার চলতে লাগল।

উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সিংহদ্বারে প্রবেশ করেছে। নগরে

নগরে গ্রামে গ্রামে মহোৎসব। একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লীগ্রামে স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সভাপতি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, কলকাতায় থাকেন, তিনি কলকাতার বহু অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণের সম্মান সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে, সেখানকার বিপুল সমারোহ, অপরিমেয় প্রাণশক্তির উল্লসিত উচ্ছ্বসিত বিকাশের অতুলনীয় দৃশ্য দেখার প্রলোভন সম্বরণ ক'রেও এখানে এসেছেন—তার কারণ তিনি এই গ্রামেরই সন্তান।

বিগত রাত্রে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম একটার সময় তিনি ছাদে বসে তাকিয়ে ছিলেন আকাশের দিকে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার জন্য—বিশেষ করে বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার জন্য আলোকসজ্জা উৎসবসূচী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পল্লীগ্রামের নিশীথ রাত্রি, আকাশের কোল থেকে পল্লীর মাথা পর্য্যন্ত অন্ধকার থম থম করছে। অকস্মাৎ সে অন্ধকারকে মথিত করে বেজে উঠল শাঁখ। ঘরে ঘরে বাজতে লাগল, ক্রমে দূর দূরান্তরের গ্রামগুলি থেকে শাঁখের সুডোল শব্দ শূন্যপথ অতিক্রম ক'রে এসে মিলিত হল এই গ্রামের শঙ্খধ্বনির সঙ্গে। দূর আকাশে তারাগুলি যেন ওই ধ্বনির স্পর্শে কাঁপতে লাগল মনে হ'ল তাঁর। তারপর এই সভামণ্ডপের প্রান্তে ধ্বনিত হল বিগ্‌ল্। ড্রাম বাজতে লাগল। মিলিত তরুণ কণ্ঠস্বরের আওয়াজ উঠল—বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, স্বাধীন ভারত কি জয়, স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ। তারপর গ্রাম গ্রামান্তর থেকে এসে মিলিত হ'ল

ছোট ছোট স্বেচ্ছাসেবকদের দল। সেই সম্মিলিত বিপুল স্বেচ্ছাসেবক দল গ্রাম ঘুরতে লাগল। মনে হল রাত্রির অন্ধকার উপেক্ষা করে এক ঘুমন্ত পুরী জেগে উঠেছে এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণায়, অন্ধকার আর তাদের সহ্য হচ্ছে না, তারা পথে পথে চলেছে নূতন দিনের সূর্য্য কোথায় কতদূরে তারই সন্ধানে।

সূর্য্য উঠল।

বিগল বাজতে লাগল, ড্রাম বাজতে লাগল, নহবৎ বাজল। মাথায় সাদা খদ্দরের টুপী পরা ছেলের দল এসে দাঁড়াল সভামণ্ডপের প্রান্তে, লম্বা একটা গোটা বাঁশ পোঁতা হয়েছে, দড়ি দিয়ে টেনে সভাপতি তেরঙ্গা ঝাণ্ডা চক্রশোভিত ভারতীয় জাতীয় পতাকা তুলবেন। সকল লোকেরই মনে হচ্ছে আরও লম্বা বাঁশ হলে ভাল হত। ওই—ওই আকাশে গিয়ে যদি ঠেকত তার মাথাটা। তারই মাথায় পত্‌পত্‌ করে উঠত তাদের এই তেরঙ্গা ঝাণ্ডা!

মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছিল বন্দেমাতরম। জয় হিন্দ মহাত্মা গান্ধী কি—জয়। নেতাজী কি—জয়। জয়—স্বাধীন ভারত কি! জয় ভারত মাতা কি! জয়—জয়—জয়।

কাতারে কাতারে লোক এসে সমবেত হল। বালক বৃদ্ধ যুবা কিশোর বালকের দল। মেয়েরা এল। হিন্দু এল, মুসলমান এল, ভদ্রলোকই বেশী। খালি-গা—খালি-পা মানুষ আসে নাই এমন নয়, তবে তারা সংখ্যায় কম। তারা এসে সভার প্রান্তভাগে স্থান গ্রহণ করলে। চোখে তাদের বিস্ময়ের দৃষ্টি। তার বেশী আর কিছু না।

একজন কানে কানে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলে—কি হবে ?

—বক্তৃতা।

—বক্তৃতা ?

—হ্যাঁ। বাবুরা রাজা হলেন কি না।

—বাবুরা রাজা হলেন ?

—হ্যাঁ। সায়েবরা চলে যাবে এ দ্যাশ থেকে।

ওদিকে সভা আরম্ভ হল। গান—তারপব বক্তৃতা। অকস্মাৎ কোথা থেকে এল আকাল। একটা জমাট সেতার বাজনার আসরে যেন ঝন্ ঝন্ শব্দে সেতারেব সব তারগুলো একসঙ্গে ছিঁড়ে দিলে সে।

কিন্তু এ কি ? এ যে পরমাশ্চর্য্যের কথা। আকাল এসে আনন্দে লাফ মারছে স্বাধীনতা উৎসবে! আকালের পিতামহ ছিল সাহেব কুঠিয়ালদেব পাইক। শেষে ডাকাতি করতে গিয়ে খুন ক'রে ধরা পড়ে ফাঁসী গিয়েছে। আকালের বাপ ছিল কুঠিয়ালদের পাইক। আকাল নিজে ছিল ডাকাত। তারপর সে চৌদ্দ সালের যুদ্ধে গিয়েছিল মেসোপটোমিয়া, মেডাল নিয়ে এসেছিল। ইংরেজের গোলামী করেছে তিন পুরুষ ধ'রে। তার এত আনন্দ কেন—কিসের ? পরাধীনতার কোন্ যাতনা সে অনুভব করেছিল ?

চল্লিশ বছর আগেও এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে সাহেব কোম্পানীর রেশম কুঠী ছিল। কুঠীর পত্তন

হয়েছিল প্রায় একশো বছর আগে। আশ-পাশের সাতখানা গ্রাম জমিদারী নিয়ে—সাহেবরা এসে তাঁবু ফেলেছিল।

আকালের বাপ চণ্ডী হাড়ী গল্প করত—সে-গল্প সে শুনেছিল তার বাপের কাছে। তেজী-তেজী-ঘোড়া। ইয়া বড় কুকুর, দু'নলা বন্দুক, কোমরে পিস্তল—আর ইয়া লম্বা চাবুক নিয়ে, কটা চোখ, লালচে চুল, সাদা চামড়ার সে এক এক 'দানো' যেন। কি হাঁক—কি ডাক। দেশের শেয়াল মেরে শেষ করে দিলে। চাবুক মেরে লোকের পিঠে দাগ এঁকে দিলে। মেয়েরা কলসী মাথায় ক'রে জল নিয়ে আসত—পিছন থেকে পিস্তলের গুলিতে কলসী ভেঙে দিয়ে সে কি আমোদ। ভাঙা কলসীর জলে মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যেত—ভয়ে তারা থর থর ক'রে কাঁপত—ওরা হাসত হো-হো-হো-হো ক'রে। মাঠে রাখালরা নিয়ে যেত গরু ভেড়া ছাগল—ওরা শিস দিয়ে দিত কুকুর ছেড়ে—তীর বেগে—কুকুরগুলো এসে লাফিয়ে পড়ত ছাগল ভেড়ার উপর, টুঁটি দিত ছিঁড়ে, সাহেবেরা কুকুরকে আদর করত। রাখালেরা কাঁদলে টাকা ছুঁড়ে দিত, আর দিত—পিঠের উপর চাবুক কষে। সন্ধ্যে বেলা হলে—গ্রাম হয়ে যেত ভয়ে নিস্তব্ধ। ওদের তাঁবুতে উঠত—হৈ-হৈ হল্লা,—বোতল বোতল মদ খেয়ে—ধেই-ধেই করে নাচত।

তারপর উঠল কুঠী।

প্রকাণ্ড কুঠী, নদীর ধারে—দুশো বিঘে ঘিরে পাঁচীল উঠল, চিমনী উঠল, কলঘর তৈরী হ'ল, গুটী থেকে রেশম বের

করবার জন্য একহাজার ঘাই তৈরী হ'ল—সাহেবদের থাকবার জন্য বড় দোতলা বাড়ী তৈরী হল, খেলবার জায়গা তৈরী হল, গোলাপ বাগ হল—এইখানকার হাড়ী—ডোম বাগ্দী বাউড়ীরা তৈরী করলে সব, সাহেবরা দিলে নগদ নগদ চকচকে পয়সা। খ্যাতি রটে গেল—সায়েবেরা মা-বাপ।

তারপর চলতে লাগল কুঠী।

চাষীরা জমিতে ধানের বদলে রেশম পোকার খাবার তুঁত-পাতার চাষ করতে লাগল। বামুন থেকে আরম্ভ করে সবাই গুটীপোকার কারবার, সে কারবার বেড়ে গেল ময়ূরাক্ষীর ক্ষ্যাপা বানের মত।

ম'ল তাঁতীরা। যারা রেশমের কাপড় বুনত।

কুঠীর রেশম চালান যেতে লাগল বিলাত। যারা ঘরে রেশম গুটী থেকে সুতা বার ক'রে দেশে কারবার করত—তাদের কারবার বন্ধ করে দিলে সাহেব। যারা আপত্তি করলে তাদের পিঠ ফেটে গেল চাবুকের ঘায়ে।

জন দুই কারবারী ছিলেন টাকাওয়ালা লোক, সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন জমিদার—তাদের ধরে এনে চাবুক মারা সহজ নয়, তাদের বাড়ীতে হ'ল ডাকাতী, মালিক হল খুন—আগুন লেগে ঘরও গেল পুড়ে।

আকালের ঠাকুরদা ছিল সেই ডাকাত দলের সর্দ্দার। আকালের বাপ বলত অন্য কারুর সাধ্যতে কুলাত না। আমার বাবা বলেই পেরেছিল। বাড়ীর মালিক—ঘরের দোরের পাশে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড খাঁড়া হাতে। যে ঘরে ঢুকবে তাকেই

জয় মা কালী বলে—হাঁকড়াবে সেই খাঁড়া। ডাকাতের দল থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

আকালের ঠাকুরদাদা বললে—নিয়ে আয় জলে ভিজিয়ে আটি আটি খড়, ধরাও তাতে মশালের আগুন। ভিজে খড়ে আগুন লাগল—জ্বলে উঠল না, উঠল বর্ষার মেঘের মত কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া। সেই ধূমন্ত খড় ফেলতে লাগল ঘরের ভিতর ছুঁড়ে। ঘর হল ধোঁয়ায় ভর্ত্তি। দম বন্ধ হয়ে মালিক এল বেরিয়ে—আকালের ঠাকুরদাদার হাতে ছিল শড়কী, সেই শড়কী গেঁথে এফোঁড় ওফোঁড় করে শুইয়ে দিলে মাটিতে।

আর এক বাড়ীর মালিক ভয়ে বিছানার গাদায় লেপ জড়িয়ে পাশ বালিশের মত ছিল পড়ে—জয় কালী বলে—লেপশুদ্ধ মানুষটাকে দু'টুকরো করে দিয়েছিল আকালের ঠাকুরদাদা।

এই খুনেই আকালের ঠাকুরদাদা পড়ল ধরা।

একটা দশবছরের মেয়ে চোরকুঠরীতে ঢুকে সব দেখেছিল; আশ্চর্য্য মেয়ে—আশ্চর্য্য চোখ তার, সে চিনত আকালের ঠাকুরদাদাকে, তেলকালী মাখা সত্ত্বেও, মাথায় মুখে কাপড়ের ফেটা বাঁধা সত্ত্বেও সে তাকে চিনতে পেরেছিল—পুলিশকে সে বলে দিলে—আদালতে সাক্ষী দিলে, হুবহু ডাকাতির বিবরণ বলে গেল—কোন কথার এতটুকু গোলমাল হল না, জেরা ক'রে সাহেবদের দেওয়া আকালের ঠাকুরদাদার উকিল হতাশ হয়ে বসে পড়ল।

ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল আকালের ঠাকুরদাদার।

সাহেব বললে—ডরো মৎ। তোমার লেড়কাকে আমি দেখব।

আকালের ঠাকুরদাদা বললে—তা দেখো। আর যখন কেউ রইল না খুন হবার, খুন করবার—তখন তুমিই দেখো। আমিই তোমার সব শত্রু শেস করে গেলাম। ছেলেটার ফাঁসী হবার ভয় রইল না।

বাপের ফাঁসী হল—ছেলে চাকরী পেলে। সাহেবদের কুঠীর পাইক হ'ল।

দাদন দেওয়া চাষীর কাছে গুটী আদায় করতে হয়, দাদন দেওয়া মজুরকে ধরে আনতে হয—তাও কালে কস্মিনে। বসে বসে তামাক খায়, কুঠীর কাজের খবরদারী করে বেত হাতে, মজুররা বসে থাকলে মাথায় ঠক করে মারে বেতের ডগা দিয়ে, বদমাস বজ্জাত যারা তাদের পিঠে মারে সপাং করে। বাস্। মাস মাস মাইনে, সাতখানা গাঁয়ে খাতির। সাহেবদের শাসনে বাঘে বলদে একসঙ্গে জল খায়,—খাওয়ায় আকালের বাপ। আকালও সে সব দেখেছে। আকাল যেত বাপের সঙ্গে। সাহেবকে দেখলেই বলত—সেলাম।

সাহেব হেসে বলত—বহুত আচ্ছা।

কখনও কখনও চকচকে ছোট্ট গোল দু-আনি, কি সিকি ছুঁড়ে বকশিস দিত।

একদিন হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

সায়েব বেড়াচ্ছিল কুঠীর হাতায়। একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা কেউটে। ফণা তুলে এল তেড়ে। সাহেব ভয়ে ঠকঠক করে কেঁপে উঠল। পকেট থেকে পিস্তল বার করে গুলি ছুঁড়লে। একটা—দুটো—তিনটে। কাঁপা হাতের গুলি একটাও লাগল না। সাপ এল এগিয়ে। আকলের বাপ ছিল খানিকটা দূরেই। সাপের বিদ্যে তার জানা ছিল। সে ছুটে এসে—সাপটার লেজে ধরেই নিলে তুলে, মারলে ঝাঁকি। সঙ্গে সঙ্গে আকালের বাপের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাহেবের ডাল কুত্তা। মেমসাহেব সাপের আক্রমণ থেকে সাহেবকে বাঁচাবার জন্যে শিস দিয়ে কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন—কুকুরটা এসে সাপটাকে না দেখে—আকালের বাপকেই শত্রু ভেবে তার ওপর পড়ল লাফ দিয়ে। আকালের বাপের এক হাতে কাল সাপ—তবু অন্য হাতে সে ধরলে কুকুরটার টুঁটি টিপে। চীৎকার করে বললে—সাহেব কুকুর ধরো।

সাহেব কুকুরটাকে ছাড়াতে চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। আকালের বাপ বললে—তা হ'লে আমি মেরে ফেলব কুকুর।

সাহেব বললে—মৎ মারো। ওর দাম—তোর জানের চেয়ে অনেক বেশী। বিলাত থেকে আনিয়েছি—আড়াইশো রূপেয়া দাম।

আড়াইশো রূপেয়া দাম! আমার দামের চেয়ে কুত্তার দাম বেশী! আকালের বাপের মাথায় খুন চড়ে গেল। কেউটের

লেজ ধরেছিল একহাতে—এক হাত বন্ধ। ঝাঁ—করে সে লেজটায় একটু দোলা দিয়ে সাপটাকে টানমেরে ফেলে দিলে দূরে। আছাড় খেয়ে পড়ল সাপটা। আকালের বাপ এবার দুহাতে ধরলে কুত্তাটার টুঁটি। দাঁতে দাঁতে টিপে পিষে দিলে তার গলাটা। তারপর ফেলে দিলে সাহেবের পায়ের কাছে একতাল কাদার মত।

সাহেব বিস্ফারিত চোখে দেখছিল—এবার রাগে ফেটে পড়ার মত বললে—মার দিয়া তুম ?

—মারব না! জান চলে যেত আমার, আমার জানের চেয়ে তোমার কুত্তার দাম বেশী? তুমি বেইমান—সাপের হাত থেকে—

আর কথা বলতে পারলে না আকালের বাপ, সাহেবের হাতের পিস্তল এখন আর কাঁপছিল না, গুলিটা এবার ফসকে গেল না, সোজা এসে বিঁধল—আকালের বাপের বুকে। আকালের বাপ, সাপটাকে নিয়ে পড়ে গেল মাটির উপর কাটা গাছের মত।

আকাল ছিল দূরে দাঁড়িয়ে—সে ছুটে এল—বাবা গো!

সাহেব তার দিকেও তুললে পিস্তল। কিন্তু মেম সাহেব এসে তার হাত ধরলে। আকালকে বললে—ভাগো ভাগো।

আকাল ছুটে পালিয়ে এল।

দেশে রটে গেল—আকালের বাপ—কুঠীর টাকা চুরি করে পালিয়েছে। থানায় থানায় হুলিয়া হল। লাস কোথায়

গেল কে জানে। বয়লারের মধ্যে পুরে দিয়েছিল। সাহেব নিজে দাঁড়িয়েছিল পিস্তল হাতে।

—বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে ?

লুকিয়ে রইল আকালকে নিয়ে আকালের মা। চলে গেল পাঁচ কোশ দূরে—ময়ূরাক্ষীর ধারে, এক ঘন জঙ্গলে ভরা গাঁয়ে। ভল্লা বাগ্দীর গ্রাম। নদীর ধারে হয় মদ চোলাই; সেই মদের ব্যবসা চালায়, রায়-বেঁশের দল আছে, বিয়ে সাদীতে নাচতে যায়, দাঙ্গাতে লাঠিয়ালী করে; মধ্যে মাঝে দেশ দেশান্তরে ডাকাতি করে—ডাকাতির মাল এনে জঙ্গলে পুঁতে রাখে, মধ্যে মধ্যে তোলে খায়। ফুরিয়ে গেলে আবার ছুটে একদিন বেরিয়ে পড়ে। ধরাও পড়ে, জেলে যায়, আবার ফিরে আসে। কেউ কেউ মরেও যায় জেলের মধ্যে। লোক দেখানো চাষের কাজও করে ওরা। ময়ূরাক্ষীর চরে শীতকালে তরীর চাষ করে। চাষ, নামেই চাষ, চাষের খাটুনী নাই। একবার প্রথমটায় পুরুষেরা চষে মাটি খুঁড়ে দেয়, তারপর ও কাজটার সকল ভার মেয়েদের উপর। ময়ূরাক্ষীর মাটি, বীজ পড়লেই গাছ। তাতে আবার খাটুনী কিসের। মেয়েরা হাঁড়ি ক'রে মধ্যে মধ্যে জল দেয়, দরকার হলে দোন-সিনিও ধরে। ফসল হলে তারাই আনে তুলে, ঝুড়ি ক'রে তারাই বিক্রী করে, গাঁয়ে গাঁয়ে, হাটেও যায়। পুরুষেরা লাঠি পাকায় তেল দিয়ে, নতুন লাঠি কাটে, লাঠি খেলে, ছেলেদের তালিম দেয়; জটলা ক'রে

মদখায়, নিজেদের মধ্যে মাথা ফাটায়, পরামর্শ করে নতুন ডাকাতির।

ওদের বড় সাধ—কুঠী লুঠ ক'রে। কিন্তু কুঠীতে বন্দুক আছে, পিস্তল আছে। নইলে ওই যে কটা-চামড়ার মানুষ গুলো ইকড়ি মিকড়ি বুলি ব'লে দেশের লোককে জুতোর ঠোক্কর আর চামড়ার চাবুক মেরে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সেজে বসে আছে—ওদের সঙ্গে একহাত লড়ে দেখবার সাধ হয়। আঃ বন্দুক যদি ওদের থাকত। আবা-বা-বা-ইয়া বলে ঝাঁপ দিযে পডত কুঠীব ফটকে। দড়ি দিয়ে ঢেঁকি ঝুলিয়ে-ঢুলিযে—মাবত ঢেঁকির ধাক্কা-ফটক পড়ত ভেঙে—দেশলাইয়ের বাক্সর মত। দুম-দুম-দুম-দুম বন্দুক চলত দুদিক থেকে। আঃ—।

আকাল বড় হয়ে হ'ল ডাকাতের সর্দ্দার। এক বড় লোকেব বাড়ীতে ডাকাতি ক'রে টাকা পয়সার সঙ্গে লুঠে আনলে দুটো বন্দুক। কাউকে না জানিয়ে তেল জবজবে ন্যাকড়া জড়িযে পুঁতে রাখলে এক ক্রোশ দূরের এক ভাঙা শিব মন্দিবে। মাটিতে পুঁতে রাখলে ইস্পাতে মরচে পড়বে; তেলে চুবানো ন্যাকডায় জড়িযে ইট পাটকেলের গাদার তলায় থাকুক পোঁতা। টোটা জোগাড করে লড়বে সে সাহেবের সঙ্গে। সে সাহেব অবিশ্যি নাই, এসেছে নতুন সাহেব। তা হোক একই জাত—সেই বুট প'রে ঠোক্কর মারে; সেই চাবুক চালায়, সেই পিস্তল ঝুলিয়ে বেড়ায়, সেই ডালকুত্তা পোষে। কিন্তু তার আগেই আকাল পড়ল ধরা। জেলে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে একটা দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেললে। রেশমের কারবার দেশ থেকে প্রায় উঠেই গেল, লোকসান খেয়ে সাহেবরা কুঠী উঠিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। আকাল ডাকাতি ছেড়ে দিলে। কি হবে? লুকানো বন্দুক দুটো তুলে ভরা-ময়ূরাক্ষীর দহে ফেলে দিয়ে এল মনের দুঃখে। মাথায় চুল রেখে দাড়ি রেখে-গলায় রুদ্রাক্ষ পরে সন্ন্যাসী হয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসীর সাজ ফেলে দিলে।

ইংরেজের সঙ্গে জার্ম্মাণীর যুদ্ধ লেগেছে—১৯১৪ সাল। লোক চাই। লড়াই করতে যেতে হবে। চলে গেল আকাল চুল কেটে দাড়ি কামিয়ে সেই যুদ্ধে। পথ তৈরী করা, মাটী কেটে লম্বা খাল কাটা কাজ। জাহাজে ক'রে চলে গেল তুর্কীর মুল্লুকে। রাঙা মুখো সাহেব কর্ণেলকে দেখেই মনে পড়ল সেই সাহেবকে—যে তার বাবাকে গুলি করে মেরেছিল। বুকের ভেতর গর্জ্জে উঠল তার আক্রোশে। কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে গুর-গুর করে উঠল বুক।

চোখের উপর দেখলে দুজন তুর্কী-সেপাই হয়েছিল বন্দী তাদের জিজ্ঞাসা করলে কি সব। তারা উত্তর দিলে না। সাহেব বললে—'হাতে পায়ে বাঁধো।' সামনে পাতা হচ্ছিল রেল লাইন; ইঞ্জিন ছিল দাঁড়িয়ে। হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে দিলে লাইনের উপর। চলে গেল ইঞ্জিন তাদের উপর দিয়ে। সমস্ত দিন কেঁদেছিল আকাল।

হঠাৎ একদিন—তাদের পল্টন হ'ল ঘেরাও। তুর্কীরা ফেললে ঘিরে।—কামান চলল—উড়োজাহাজ ফেললে বোমা।

সে কি দিন রাত্রি! চারিদিকে ভয়—পল্টনের লোকেরা বলে—তুর্কীর হাতে পড়লে রক্ষা নাই। সে মৃত্যু ভয়ঙ্কর মৃত্যু! সে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! গভীর রাত্রে হানাহানির মধ্যে আকাল ছুটল—পালাবে সে! কোন দিকে পালাবে—জানে না—তবু ছুটল। মড়া মানুষের গায়ে হুঁচোট খেয়ে পড়ে যায়—আবার ওঠে আবার পালায়। কোমরে নিয়েছিল, জলের বোতল, একটা কিরীচ। আর একজন মরা সাহেবের কোমর থেকে খুলে নিয়েছিল—তার পিস্তল আর গুলির বেল্ট। কতদূরে এসে, কে জানে কতদূর—সে আর চলতে পারলে না, শুয়ে পড়ল।

রোদ উঠল্। চারিদিকে শুধু বালি—বালি—আর বালি। ধূ-ধূ করছে চারিদিক! কেউ—কোথাও নাই। সে উঠল, উঠে চলতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল—একটা ঘোড়া মরে পড়ে আছে। ঘোড়াটির ওপাশে একটা মানুষ। একজন সাহেব—উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কর্ণেল—তাদের সেই ভয়ঙ্কর সাহেব! কিরীচটা বার করলে সে। হোক মরা। ওর মরা বুকেই বসিয়ে দেবে কিরীচ। সাহেবের দেহটাকে —উল্টে দিলে। সাহেব মরে নি, ধুঁকছে। ধ্বক করে জ্বলে উঠল আকালের চোখ। দুই হাতে সাহেব বুকের উপর কি ধরে রয়েছে। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

আকাল টেনে ছিনিয়ে নিলে—হাতের জিনিষটা। একটা ছবি। একটি মেম—তার পাশে একটি ছেলে। ওই ছবিটা দেখে আকালের কি হয়ে গেল! সাহেব একবার তাকালে তার দিকে। সে শিউরে উঠল। আকালের মনে পড়ে

গেল—তার বাপ যখন গুলি খেয়েছিল—তখন ঠিক এই এমনি করে আকালের দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখ কাল—এর চোখ কটা—এই যা তফাৎ। কি যে হয়ে গেল আকালের! মনে মনে বললে—তোর ধর্ম্ম—তোর কাছে—আমার ধর্ম্ম আমার কাছে।

সে সাহেবের মুখে জল দিলে। তারপর সাহেবকে কাঁধে তুলে চলতে সুরু করলে।

দুদিন পর—ভগবান বাঁচালেন। একটা ছোট দল—পল্টন তাদের দূর থেকে হেঁকে বললে—থামো!

ভাগ্যক্রমে তারা ইংরেজের পল্টন!

আকাল হাঁসপাতালে শুয়ে তখনও অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল। বললে—বলতে পারো বাবু মশাই—দেহ আমার রোগাই হোক—আর যত বুড়োই আমি হই, আজ কি আমি চুপ করে থাকতে পারি! বাবু মশাই আজও আমার আপশোষ হয়—কেন, আমি সে দিন সেই দানোর মত সাহেবটা—যে সাহেবটা ঠিক যে সাহেব আমার বাবাকে গুলী করেছিল—তারই মত দেখতে, তাকে কেন আমি খুন করে বাবার মরণের শোধ নিতে পারি নাই। কি যে ধরম—ধরম আমার মাথায় চেপেছিল—

সভাপতি বললেন—তুমি ঠিকই করেছিলে আকাল। আজ যে পুণ্যের বলে আমরা স্বাধীনতা পেলাম—

আকাল বললে—স্বাধীনতা কি বলছ গো, সাহেবরা চলে গেল, তাই বল।

—হ্যাঁ। তাই। যে পুণ্যে স্বাধীনতা পেলাম—তার মধ্যে তোমার ওই সে দিনের পুণ্যও আছে। এই দেশে তোমার জন্ম বলেই তুমি তা পেরেছিলে।

আকালের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে—সত্যি বলছ ?

—সত্যিই বলছি আকাল। সত্যি! এখন একটু স্থির হয়ে বিশ্রাম কর। একটু ঘুমোও।

—ঘুমোব। সে চোখ বুজলে, আবার চোখ খুলে বললে—আজ মরে গেলেই ভাল হত বাবু! ধরমরাজ আমার মান রেখেছে, বাবার মরণের আজ শোধবোধ হয়েছে।

তার কপালে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন সভাপতি।

—শেষ—